আত্মশক্তি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা,

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

১৩১২

বাঁধাই ৸০ বার আনা। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

সূচী।

আত্মশক্তি।

নেশন কি ?

"নেশন্ ব্যাপারটা কি—"সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাবুক রেনাঁ এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমে দুই একটা শব্দার্থ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

স্বীকার করিতে হইবে, বাঙলায় 'নেশন'-কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিতভাষায় সাধারণতঃ জাতি বলিতে বর্ণ বুঝায়; এবং জাতি বলিতে ইংরাজিতে যাহাকে race বলে, তাহাও বুঝাইয়া থাকে। আমরা 'জাতি'-শব্দ ইংরাজি 'রেস্'-শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব,—এবং নেশনকে নেশনেই বলিব। নেশন্ ও ন্যাশনাল্ শব্দ বাঙলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ান যায়।

'ন্যাশনাল্ কন্‌গ্রেস্' শব্দের তর্জ্জমা করিতে আমরা 'জাতীয় মহা-সভা' ব্যবহার করিয়া থাকি—কিন্তু জাতীয় বলিলে বাঙালী-জাতীয়, মারাঠী-জাতীয়, শিখজাতীয়, যে কোন জাতীয় বুঝাইতে পারে—ভারতবর্ষের সর্ব্বজাতীয় বুঝায় না। মান্দ্রাজ ও বম্বাই, 'ন্যাশনাল'-শব্দের অনুবাদচেষ্টায় জাতিশব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় ন্যাশনাল্ সভাকে মহাজনসভা ও সার্ব্বজনিকসভা নাম দিয়াছেন—বাঙালী কোনপ্রকার চেষ্টা না করিয়া 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন্' নাম দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে মারাঠী প্রভৃতি জাতির

সহিত বাঙালীর যেন একটা প্রভেদ লক্ষিত হয়—সেই প্রভেদে বাঙালীর আন্তরিক ন্যাশনালত্বের দুর্ব্বলতাই প্রমাণ করে।

'মহাজন' শব্দ বাঙলায় একমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্য অর্থে চলিবে না। 'সার্ব্বজনিক' শব্দকে বিশেষ্য আকারে নেশন্ শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না। 'ফরাসী সর্ব্বজন' শব্দ 'ফরাসী নেশন্' শব্দের পরিবর্ত্তে সঙ্গত শুনিতে হয় না।

'মহাজন' শব্দ ত্যাগ করিয়া 'মহাজাতি' শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মহৎ'শব্দ মহত্ত্বসূচক বিশেষরূপে অনেকস্থলেই নেশন-শব্দের পূর্ব্বে আবশ্যক হইতে পারে। সেরূপ স্থলে 'গ্রেট নেশন্' বলিতে গেলে 'মহতী মহাজাতি' বলিতে হয় এবং তাহার বিপরীত বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে 'ক্ষুদ্র মহাজাতি' বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু নেশন্-শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছু-মাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরাজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরাজি রাখিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শঙ্করের মায়া ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ শব্দ ইংরাজি রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।

রেনাঁ বলেন, প্রাচীনকালে 'নেশন্' ছিল না। ইজিপ্ট, চীন, প্রাচীন কাল্‌ডিয়া, 'নেশন্' জানিত না। আসিরিয়, পারসিক ও আলেক্‌জাণ্ডারের সাম্রাজ্যকে কোন নেশনের সাম্রাজ্য বলা যায় না।

রোমসাম্রাজ্য নেশনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নেশন্ বাঁধিতে না বাঁধিতে বর্ব্বরজাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুক্‌রা হইয়া গেল। এই সকল টুক্‌রা বহুশতাব্দী ধরিয়া নানাপ্রকার সংঘাতে ক্রমে দানা বাঁধিয়া নেশন্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ফ্রান্স্, ইংলণ্ড্, জর্ম্মাণি ও রাশিয়া সকল নেশনের শীর্ষস্থানে মাথা তুলিয়াছে।

কিন্তু ইহারা নেশন্ কেন ? সুইজর্‌লাণ্ড্ তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন্ হইল, অষ্ট্রীয়া কেন কেবলমাত্র রাজ্য হইল, ‘নেশন্’ হইল না ?

কোন কোন রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ বলেন, নেশনের মূল রাজা। কোন বিজয়ী বীর প্রাচীনকালে লড়াই করিয়া দেশ জয় করেন, এবং দেশের লোক কালক্রমে তাহা ভুলিয়া যায় ; সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন্ পাকাইয়া তোলে। ইংলণ্ড্, স্কট্‌লণ্ড্, আয়র্লণ্ড্ পূর্ব্বে এক ছিল না, তাহাদের এক হইবার কারণও ছিল না, রাজার প্রতাপে ক্রমে তাহারা এক হইয়া আসিয়াছে। নেশন্ হইতে ইটালির এত বিলম্ব করিবার কারণ এই যে, তাহার বিস্তর ছোট ছোট রাজার মধ্যে কেহ একজন মধ্যবর্ত্তী হইয়া সমস্ত দেশে ঐক্যবিস্তার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ নিয়ম সকল জায়গায় খাটে নাই। যে সুইজর্‌লাণ্ড্ ও আমেরিকার য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ ক্রমে ক্রমে সংযোগ সাধন করিতে করিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা ত রাজবংশের সাহায্য পায় নাই।

রাজশক্তি নাই নেশন্ আছে, রাজশক্তি ধ্বংশ হইয়া গেছে নেশন্ টিঁকিয়া আছে, এ দৃষ্টান্ত কাহারো অগোচর নাই। রাজার অধিকার সকল অধিকারের উচ্চে, এ কথা এখন আর প্রচলিত নহে ; এখন স্থির হইয়াছে, ন্যাশনাল্ অধিকার রাজকীয় অধিকারের উপরে। এই ন্যাশনাল্ অধিকারের ভিত্তি কি, কোন্ লক্ষণের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে ?

অনেকে বলেন, জাতির অর্থাৎ raceএর ঐক্যই তাহার লক্ষণ। রাজা, উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব,—জাতি চিরদিন থাকিয়া যায়, তাহারই অধিকার খাঁটি।

কিন্তু জাতিমিশ্রণ হয় নাই য়ুরোপে এমন দেশ নাই। ইংলণ্ড্, ফ্রান্স্, জর্ম্মানি, ইটালি, কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়

না, এ কথা সকলেই জানেন। কে টিউটন্, কে কেল্ট্, এখন তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রে জাতিবিশুদ্ধির কোন খোঁজ রাখে না। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে জাতি এক ছিল, তাহারা ভিন্ন হইয়াছে, যাহারা ভিন্ন ছিল, তাহারা এক হইয়াছে।

ভাষাসম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। ভাষার ঐক্যে ন্যাশনাল্ ঐক্য-বন্ধনের সহায়তা করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে এক করিবেই, এমন কোন জবরদস্তি নাই। য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ও ইংলণ্ডের ভাষা এক, স্পেন্ ও স্পানীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু তাহারা এক নেশন্ নহে। অপর পক্ষে সুইজর্ল্যাণ্ডে তিনটা চারিটা ভাষা আছে, তবু সেখানে এক নেশন্। ভাষা অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি বড়;—ভাষাবৈচিত্রসত্ত্বেও সমস্ত সুইজর্ল্যাণ্ডের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এক করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথাও ঠিক নয়। প্রসিয়া আজ জর্ম্মণ বলে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে স্লাভোনিক্ বলিত, ওয়েল্স্ ইংরাজি ব্যবহার করে, ইজিপ্ট আরবী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

নেশন্ ধর্ম্মমতের ঐক্যও মানে না। ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক্, প্রটেষ্টাণ্ট্, য়িহুদী অথবা নাস্তিক, যাহাই হউক না কেন, তাহার ইংরাজ, ফরাসী বা জর্ম্মণ হইবার কোন বাধা নাই।

বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন দৃঢ়বন্ধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু রেনাঁর মতে সে বন্ধন নেশন্ বাঁধিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈষয়িক স্বার্থে মহাজনের পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে; কিন্তু ন্যাশনালত্বের মধ্যে একটা ভাবের স্থান আছে—তাহার যেমন দেহ আছে, তেমনি অন্তঃকরণেরও অভাব নাই। মহাজনপটিকে ঠিক মাতৃভূমি কেহ মনে করে না।

ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমাবিভাগ নেশনের ভিন্নতাসাধনের একটা প্রধান হেতু, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নদীস্রোতে জাতিকে বহন করিয়া লইয়া গেছে, পর্ব্বতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ম্যাপে আঁকিয়া দেখাইয়া দিতে পারে, ঠিক কোন্ পর্য্যন্ত কোন্ নেশনের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। মানবের ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, জাতিতে, ভাষায়, নেশন্ গঠন করে না। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর-ঐতিহাসিক-মন্থনজাত 'নেশন্' একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।

দেখা গেল, জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্ম্মের ঐক্য ও ভৌগলিক সংস্থান, নেশন-নামক মানসপদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কি ?

নেশন একটি সজীব-সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিষ এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিষ বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিতি, আর একটি বর্ত্তমানে। একটি হইতেছে—সর্ব্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ্; আর একটি, পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা,—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমত নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীতকালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা পূর্ব্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য্য, মহত্ত্ব,

কীর্ত্তি, ইহার উপরেই ন্যাশন্যাল্ ভাবের মূলপত্তন। অতীতকালে সর্ব্বসাধারণের এক গৌরব, এবং বর্ত্তমানকালে সর্ব্বসাধারণের এক ইচ্ছা; পূর্ব্বে একত্রে বড় কাজ করা, এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সঙ্কল্প; ইহাই জনসম্প্রদায়গঠনের ঐকান্তিক মূল। আমরা যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আমাদের ভালবাসা সেই পরিমাণে প্রবল হইবে। আমরা যে বাড়ী নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব, সে বাড়ীকে আমরা ভালবাসি। প্রাচীন স্পার্টার গানে আছে—"তোমরা যাহা ছিলে, আমরা তাহাই; তোমরা যাহা, আমরা তাহাই হইব।"—এই অতি সরল কথাটি সর্ব্বদেশের ন্যাশন্যাল্-গাথাস্বরূপ।

অতীতের গৌরবময়-স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ; একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা; এইগুলিই আসল জিনিষ, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্যসত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়—একত্রে মাশুলখানা-স্থাপন বা সীমান্তনির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি। একত্রে দুঃখ পাওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।

অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্ব্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তাহাই নেশন্। ইহার পশ্চাতে একটি অতীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে—সাধারণ সম্মতি,—সকলে মিলিয়া একত্রে একজীবন বহন করিবার সুস্পষ্টপরিব্যক্ত ইচ্ছা।

রেনাঁ বলিতেছেন, আমরা রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে রাজার অধিকার ও ধর্ম্মের আধিপত্য নির্ব্বাসিত করিয়াছি, এখন বাকি কি রহিল?

মানুষ, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের প্রয়োজনসকল। অনেকে বলিবেন, ইচ্ছা-জিনিষটা পরিবর্ত্তনশীল, অনেক সময় তাহা অনিয়ন্ত্রিত, অশিক্ষিত,—তাহার হস্তে নেশনের ন্যাশনালিটির মত প্রাচীন মহৎ-সম্পদ্ রক্ষার ভার দিলে, ক্রমে যে সমস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

মানুষের ইচ্ছার পরিবর্ত্তন আছে—কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু আছে, যাহার পরিবর্ত্তন নাই ? নেশনরা অমর নহে। তাহাদের আদি ছিল, তাহাদের অন্তও ঘটিবে। হয় ত এই নেশন্দের পরিবর্ত্তে কালে এক য়ুরোপীয় সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেও পারে। কিন্তু এখনো তাহার লক্ষণ দেখি না। এখনকার পক্ষে এই নেশন্সকলের ভিন্নতাই ভাল, তাহাই আবশ্যক। তাহারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে—এক আইন, এক প্রভু হইলে, স্বাধীনতার পক্ষে সঙ্কট।

বৈচিত্র এবং অনেকসময় বিরোধিপ্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন্ সভ্যতাবিস্তারকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসঙ্গীতে প্রত্যেকে এক একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।

যাহাই হউক, রেনাঁ বলেন, মানুষ, জাতির, ভাষার, ধর্ম্মমতের বা নদীপর্ব্বতের দাস নহে। অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসঙ্ঘ যে একটি সচেতন চারিত্র সৃজন করে, তাহাই নেশন্। সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগস্বীকারের দ্বারা এই চারিত্র-চিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে, ততক্ষণ তাহাকে সাঁচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

রেনাঁর উক্তি শেষ করিলাম। এক্ষণে রেনাঁর সারগর্ভ বাক্যগুলি

আমাদের দেশের প্রতি প্রয়োগ করিয়া আলোচনার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক্।

ভারতবর্ষীয় সমাজ।

তুরস্ক যে যে জায়গা দখল করিয়াছে, সেখানে রাজশাসন এক কিন্তু আর কোন ঐক্য নাই। সেখানে তুর্কি, গ্রীক্, আর্ম্মাণি, স্লাভ্, কুর্দ্দ, কেহ কাহারো সঙ্গে না মিশিয়া, এমন কি পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিয়া কোন মতে একত্রে আছে। যে শক্তিতে এক করে, সেই শক্তিই সভ্যতার জননী—সেই শক্তি তুরস্করাজ্যের রাজলক্ষ্মীর মত হইয়া এখনো আবির্ভূত হয় নাই।

প্রাচীন য়ুরোপে বর্ব্বর জাতেরা রোমের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যটাকে বাটোয়ারা করিয়া লইল। কিন্তু তাহারা আপন আপন রাজ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল—কোথাও জোড়ের চিহ্ন রাখিল না। জেতা ও বিজিত ভাষায় ধর্ম্মে সমাজে একাঙ্গ হইয়া এক একটি নেশন্-কলেবর ধরিল। সেই যে মিলনশক্তির উদ্ভব হইল, সেটা নানাপ্রকার বিরোধের আঘাতে শক্ত হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট আকার ধরিয়া সুদীর্ঘকালে এক একটি নেশন্‌কে এক একটী সভ্যতার আশ্রয় করিয়া তুলিয়াছে।

যে কোন উপলক্ষ্যে হৌক অনেক লোকের চিত্ত এক হইতে পারিলে তাহাতে মহৎ ফল ফলে। যে জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই এক হইবার শক্তি স্বভাবতই কাজ করে, তাহাদের মধ্য হইতেই কোন না কোন প্রকার মহত্ত্ব অঙ্গধারণ করিয়া দেখা দেয়, তাহারাই সভ্যতাকে জন্ম দেয়, সভ্যতাকে পোষণ করে। বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ। সভ্য য়ুরোপ জগতে সদ্ভাব বিস্তার করিয়া ঐক্য-

সেতু বাঁধিতেছে—বর্ব্বর য়ুরোপ বিচ্ছেদ, বিনাশ, ব্যবধান স্বজন করিতেছে, সম্প্রতি চীনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীনে কেন, আমরা ভারতবর্ষে য়ুরোপের সভ্যতা ও বর্ব্বরতা উভয়েরই কাজ প্রত্যক্ষ করিতে পাই। সকল সভ্যতার মর্ম্মস্থলে মিলনের উচ্চ আদর্শ বিরাজ করিতেছে বলিয়াই, সেই আদর্শমূলে বিচার করিবার বর্ব্বরতার বিচ্ছেদ অভিঘাতগুলা দ্বিগুণ বেদনা ও অপমানের সহিত প্রত্যহ অনুভব করিয়া থাকি।

এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে একভাবে সাধিত হয় না। এইজন্য য়ুরোপীয়ের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে কথা বলা যায় না। সে ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার—কারণ নেশন ও ন্যাশনাল্ কথাটা আমাদের নহে, য়ুরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি নিজের বিশেষ ঐক্যকেই স্বভাবতঃ সব চেয়ে বড় মনে করে। যাহাতে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে ও বিরাট করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে সে মর্ম্মে মর্ম্মে বড় বলিয়া চিনিয়াছে, আর কোন আশ্রয়কে সে আশ্রয় বলিয়া অনুভব করে না। এইজন্য য়ুরোপের কাছে ন্যাশনাল্ ঐক্য অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ;—আমরাও য়ুরোপীয় গুরুর নিকট হইতে সেই কথা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যাশনাল্ ভাবের অভাবে লজ্জা বোধ করিতেছি।

সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য্য—বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা—হিন্দু তাহার কি করিয়াছে দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্য্যকে ন্যাশনাল্ নাম দাও বা যে কোন নাম দাও, তাহাতে কিছু আসে যায় না, মানুষবাঁধা লইয়াই বিষয়।

নানা যুদ্ধবিগ্রহ-রক্তপাতের পর য়ুরোপের সভ্যতা যাহাদিগকে এক নেশনে বাঁধিয়াছে, তাহারা সবর্ণ। ভাষা ও কাপড় এক হইয়া গেলেই

তাহাদের আর কোন প্রভেদ চোখে পড়িবার ছিল না। তাহাদের কে জেতা কে জিত, সে কথা ভুলিয়া যাওয়া কঠিন ছিল না। নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতির দরকার, তেমনি বিস্মৃতির দরকার—নেশনকে বিচ্ছেদ-বিরোধের কথা যত শীঘ্র সম্ভব ভুলিতে হইবে। যেখানে দুইপক্ষের চেহারা এক, বর্ণ এক, সেখানে সকলপ্রকার বিচ্ছেদের কথা ভোলা সহজ—সেখানে একত্রে থাকিলে মিলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক যুদ্ধ-বিরোধের পরে হিন্দুসভ্যতা যাহাদিগকে এক করিয়া লইয়াছিল, তাহারা অসবর্ণ। তাহারা স্বভাবতই এক নহে। তাহাদের সঙ্গে আর্য্যজাতির বিচ্ছেদ শীঘ্র ভুলিবার উপায় ছিল না।

আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ায় কি ঘটিয়াছে? য়ুরোপীয়গণ যখন সেখানে পদার্পণ করিল, তখন তাহারা খৃষ্টান, শত্রুর প্রতি প্রীতি করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে একেবারে উন্মূলিত না করিয়া তাহারা ছাড়ে নাই—তাহাদিগকে পশুর মত হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যে নেশন বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাসীরা মিশিয়া যাইতে পারে নাই।

হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী; দ্রাবিড়ী তৈলঙ্গী, নায়ার,—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দুসভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই—উচ্চ, নীচ, সবর্ণ, অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্ম্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে

কর্ত্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।

রেনাঁ দেখাইয়াছেন, নেশনের মূল লক্ষণ কি, তাহা বাহির করা শক্ত। জাতির ঐক্য, ভাষার ঐক্য, ধর্ম্মের ঐক্য, দেশের ভূসংস্থান; এ সকলের উপরে ন্যাশনালত্বের একান্ত নির্ভর নহে। তেমনি হিন্দুত্বের মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা শক্ত। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম, নানাপ্রকার বিরুদ্ধ আচার-বিচার হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পরিধি যত বৃহৎ, তাহার কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া ততই শক্ত। হিন্দু-সমাজের ঐক্যের ক্ষেত্র নিরতিশয় বৃহৎ, সেইজন্য এত বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল আশ্রয়টি বাহির করা সহজ নহে।

এ স্থলে আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা প্রধানতঃ কোন্ দিকে মন দিব? ঐক্যের কোন্ আদর্শকে প্রাধান্য দিব?

রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, মিলন যত প্রকারে হয় ততই ভাল। কন্‌গ্রেসের সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা অনুভব করিয়াছেন যে, সমস্তই যদি ব্যর্থ হয়, তথাপি মিলনই কন্‌গ্রেসের চরম ফল। এই মিলনকে যদি রক্ষা করিয়া চলি, তবে মিলনের উপলক্ষ্য বিফল হইলেও, ইহা নিজেকে কোন না কোন দিকে সার্থক করিবেই—দেশের পক্ষে কোন্‌টা মুখ্য ব্যাপার, তাহা আবিষ্কার করিবেই—যাহা বৃথা এবং ক্ষণিক, তাহা আপনি পরিহার করিবে।

কিন্তু এ কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সঙ্কটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎ-

সরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহুদুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাতটাকা বেতনের তিনটাকা পেটে খাইয়া চারটাকা বাড়ী পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোটভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড় বলিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্ম্মের মন্ত্র কাণে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্ব্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজ ত আছেই, সে ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষ গড়িয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই।

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। এইখানেই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা বর্ত্তমান হিন্দুসভ্যতাকে জিতিয়াছে।

য়ুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা। অতীতের সহিত নেশনের বর্ত্তমানের যে কেবল জড় সম্বন্ধ, তাহা নহে—পূর্ব্বপুরুষ প্রাণপাত করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান পুরুষ চোখ বুজিয়া ফলভোগ করিতেছে তাহা নহে। অতীত-বর্ত্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে—অখণ্ড কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। এক অংশ প্রবাহিত, আর এক অংশ বদ্ধ, এক অংশ প্রজ্বলিত, অপরাংশ নির্ব্বাপিত, এরূপ নহে। সে হইলে ত সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইয়া গেল—জীবনের সহিত মৃত্যুর কি সম্পর্ক?

কেবলমাত্র অলসভক্তিতে যোগসাধন করে না—বরং তাহাতে দূরে

লইয়া যায়। ইংরাজ যাহা পরে, যাহা খায়, যাহা বলে, যাহা করে, সবই ভাল, এই ভক্তিতে আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে—তাহাতে আসল ইংরাজত্ব হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়। কারণ, ইংরাজ এরূপ-নিরুদ্যম অনুকরণকারী নহে। ইংরাজ স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার জোরেই বড় হইয়াছে—পরের-গড়া জিনিষ অলসভাবে ভোগ করিয়া তাহারা ইংরাজ হইয়া উঠে নাই। সুতরাং ইংরাজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরাজত্ব আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইবে।

তেমনি আমাদের পিতামহেরা যে বড় হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপরে নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেইজন্যই তাঁহারা বড় হইতে পারিয়াছেন। আমাদের চিত্ত যদি তাঁহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়, কেবল তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের সহিত আমাদের জড়সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের আর ঐক্য নাই। পিতা-মাতার সহিত পুত্রের জীবনের যোগ আছে—তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রকমে কাজ করে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের মনে যদি তাহার কোন নিদর্শন না পাই—আমরা যদি কেবল তাঁহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর সজীব নাই। শণের-দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য্য। আমরা একটা বড় রকমের যাত্রার দল—গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজসরঞ্জামে পূর্ব্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।

পূর্ব্বপুরুষদের সেই চিত্তকে আমাদের জড় সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে, তবেই আমরা বড় হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন

মহৎ-স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া উঠে—নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে সবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়।

জীবনের পরিবর্ত্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্ত্তন বিকার। আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া, সে পরিবর্ত্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে—কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

সজীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে—আর নির্জ্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য্য নাই; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্যচেষ্টা নাই—বাহির হইতে পরিবর্ত্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।

নূতন অবস্থা, নূতন শিক্ষা, নূতন জাতির সহিত সংঘর্ষ—ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমন ভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বসিয়া আছি, তবে সেই তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের বন্যা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা বর্ত্তমানকে স্বীকারমাত্র না করিয়া পূর্ব্বপুরুষের দোহাই মানিলেও পূর্ব্বপুরুষ সাড়া দিবেন না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আমাদের দোহাই পাড়িয়া বলিতেছেন, বর্ত্তমানের সহিত সন্ধি করিয়া আমাদের কীর্ত্তিকে রক্ষা কর, তাহার প্রতি অন্ধ হইয়া

ইহাকে সমূলে ধ্বংস হইতে দিয়ো না। আমাদের ভাবসূত্রটিকে রক্ষা করিয়া সচেতনভাবে এককালের সহিত আর এক কালকে মিলাইয়া লও, নহিলে সূত্র আপনি ছিন্ন হইয়া যাইবে।

কি করিতে হইবে? নেশনের প্রত্যেকে ন্যাশন্যাল্ স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। যে সময় হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত সমাজকলেবরের স্বার্থকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। রাজা সমাজেরই অঙ্গ ছিলেন, সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর—ব্রাহ্মণ, সমাজের মধ্যে সমাজধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্ত নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, ভাবে, কর্ম্মে, সমুন্নত রাখিবার জন্য সমাজের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রদিকে সচেষ্টভাবে কাজ করিত। তখনকার নিয়ম তখনকার অনুষ্ঠান তখনকার কালের হিসাবে নিরর্থক ছিল না।

এখন সেই নিয়ম আছে, সেই চেতনা নাই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচেষ্টতা নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্ব্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধন-সম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল,—ইহাকে বাণিজ্যহিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্ম্মযোগ, এই কথা নিয়তস্মরণ করা ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন

করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা ইহাই হিন্দুত্ব। ইহাতে পশু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতি কল্যাণভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং নিয়ত অভ্যাসে স্বার্থপরিহার করা নিশ্বাসত্যাগের ন্যায় সহজ হইয়া আসে। সমাজের নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড় চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্ত্তমানের সহিত অতীতের ধর্ম্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের এই একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতিক চেষ্টায় যে কোন ফল নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের সামাজিক ঐক্যসাধনে কিয়দ্দূর সহায়তা করিতে পারে, এই তাহার প্রধান গৌরব।

স্বদেশী সমাজ।

(বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।)

"সুজলা সুফলা" বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক-পক্ষীর মত ঊর্দ্ধের দিকে তাকাইয়া আছে—কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জ্জন সুরু হইয়াছে—গবর্মেণ্ট সাড়া দিয়াছেন—তৃষ্ণানিবারণের যা-হয়-একটা উপায় হয় ত হইবে—অতএব আপাতত আমরা সেজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্ব্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল,—যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব

আপনিই মিটাইয়া লইত—দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না?

আমাদের যে সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কর্জ্জন্‌সাহেব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, না হয় অ্যাণ্ড্রুয়ুল্-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্ত্তি করিতে থাকুন্; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্বালাময় তরলরসের তৃষ্ণা —যাহা প্রলয়কালের সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে—তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিমদিগ্দেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসঙ্গত হয় না— কিন্তু জলের তৃষ্ণা ত স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিষ!—ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট্ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালরূপেই হইয়া আসিয়াছে—এজন্য শাসনকর্ত্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমশায় শুভঙ্করী কসাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্ত্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গন মুখরিত।

সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে সুদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে! নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্তচলাচলের জন্য যেমন টৌন্‌হল্‌মীটিং অনাবশ্যক—সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিষ নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করি-

বার কেহ নাই, সমৃদ্ধঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকারবাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি ?

ইংরাজিতে যাহাকে ষ্টেট্ বলে, আমাদের দেশে আধুনিকভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের ষ্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্ম্মের ভার ষ্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্ত্তব্য ছিল না, তাহা নহে।—কিন্তু কেবল আংশিকভাবে —বস্তুত সাধারণত সে কর্ত্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে—কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেম্নি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন—তাহারা কর্ত্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত বড় বড় কর্ত্তব্য-

ভারি রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্ম্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন,—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্য্যরূপে, বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগ চর্চ্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্ম্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়—এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে ষ্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত —এইজন্য ইংরাজ ষ্টেট্‌কে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্ম্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই ষ্টেট্‌কে জাগ্রত রাখিতে, সচেষ্ট রাখিতে জন-

সাধারণ সর্ব্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরাজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানির্ব্বিচারে গবর্মেণ্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্ম্মভার সাধারণের সর্ব্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভাল, না তাহা বিশেষভাবে সরকারনামক একটা জায়গায় নির্দ্দিষ্ট হওয়া ভাল। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিংক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে—বিলাতরাজ্যের ষ্টেট্ সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না—অত্যন্ত ভাল হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য !

আমাদের দেশে সরকারবাহাদুর সমাজের কেহই নন্, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্ম্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানাজাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই।

সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভূক্ত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্ত্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি—কোনো আপত্তি করি নাই। এপর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাঁধিয়া গেছে,—পরিবর্ত্তনমাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্ম্মস্থান—যে মর্ম্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই-আমাদের অন্তরতম মর্ম্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ্, জলকষ্ট বিপদ্ নহে।

পূর্ব্বে যাঁহারা বাদ্‌শাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লী তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। জন্মভূমির

সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লি হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের গণ্ডগ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চ্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই; কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে।

এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক্, বিদ্যা ও ধনমান অর্জ্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালিজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্ম্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালীকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্টা-পাল্টা হইয়া না যায়! বাহিরে অর্জ্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

এইজন্য কবিকথিত "স্রোতের সেঁওলি"র মত ভাসিয়াই চলিয়াছি।

কিন্তু বাঙালির চিত্ত ঘরের মুখ লইয়াছে,—নানা দিক্ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে এবং স্বদেশী ভাষা স্বদেশী সাহিত্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নহে, স্বদেশের শিল্পদ্রব্য আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, স্বদেশের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজদ্বারে ভিক্ষাযাত্রার জন্য যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যহই একটু একটু করিয়া আমাদিগকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অদ্ভুত অসঙ্গতি আমাদের চোখে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রোভিন্শ্যাল্ কন্ফারেন্স্ই তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। এ কন্ফারেন্স্ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরাজিশিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—আপামরসাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে-অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল-সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই।

পোলিটিক্যাল্ সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল্ শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরমলাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্য্যকলাপে যে সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে সমস্তকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে কর, প্রোভিন্শ্যাল্ কন্‌ফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্য্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কি করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতিধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশীধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভাল কথক, কীর্ত্তনগায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক্-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে—তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লিবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎজগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হয়,—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান

করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমনি আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেম্‌নি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয়, তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লিগুলি যেদিন হাললাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখানে নানাস্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার পরে এই সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন,—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতিসম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশের নানাস্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন; তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা,

কীর্ত্তন, কথকতা রচনা করিয়া, সঙ্গে বায়স্কোপ্, ম্যাজিকৃলণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন--তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থাদ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্য্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইঁহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্য-রস ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদিব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ আহ্লাদ, সমস্তই কেবল সহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্ম্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না—সে স্থলে "ইতরে জনাঃ" মিষ্টান্নের উপায় জোগাইয়া থাকে, কিন্তু "মিষ্টান্নম্" "ইতরে জনাঃ" কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না—ভোগ করেন "বান্ধবাঃ" এবং "সাহেবাঃ"। ইহাতে বাংলার গ্রাম সকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণলোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলাসম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লিদ্বারে

আর একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল বড় বড় জলাশয় আমাদিগকে জলদান, স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে, তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে—তেম্‌নি আমাদের দেশে যে সকল মেলা ধর্ম্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে, তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হইব।

এ কথা শুনিবামাত্র যেন আমাদের মধ্যে হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া না ওঠেন—এ কথা না বলিয়া বসেন যে, এই মেলাগুলির প্রতি গবর্মেণ্টের অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে—অতএব আমরা সভা করিয়া কাগজে লিখিয়া প্রবলবেগে গবর্মেণ্টের সাঁকো নাড়াইতে সুরু করিয়া দিই—মেলাগুলার মাথার উপরে দলবল-আইন-কানুন-সমেত পুলিস কমিশনার ভাঙিয়া পড়ুক—সমস্ত একদমে পরিষ্কার হইয়া যাক্। ধৈর্য্য ধরিতে হইবে,—বিলম্ব হয়, বাধা পাই, সেও স্বীকার, কিন্তু এ সমস্ত আমাদের নিজের কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘর নিকাইয়া আসিয়াছেন,—ম্যুনিসিপালিটির মজুর নয়। ম্যুনিসিপালিটির সরকারি ঝাঁটায় পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জ্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে, এ কথা আমরা যেন না ভুলি।

আমাদের দিশী লোকের সঙ্গে দিশী ধারায় মিলিবার যে কি উপলক্ষ্য

হইতে পারে, আমি তাহারি একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র—এবং এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কি করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের মঙ্গল ব্যাপার বলিয়া গণ্যই করেন না তাঁহাদিগকে অন্যপক্ষে "পেসিমিষ্ট্" অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভ-দ্রাক্ষাগুচ্ছলুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ "পেসিমিষ্ট্" আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হৌক্, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কি, আমাদিগকে চারিদিক্ হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে,

সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামি-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে—এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এই জন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্য্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালমন্দ দুই দিক্ই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়, ইহা প্রাচ্য।

জাপানযুদ্ধব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধব্যাপারটি একটা কলের জিনিষ, সন্দেহ নাই—সৈন্যদিগকে কলের মত হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতই চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক সৈন্য সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে;—তাহারা অন্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোন্মাদগ্রস্ত পশুবৎ ও নহে; তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত এবং সেই সূত্রে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—সেই সম্বন্ধের নিকট তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্য আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত—রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্চখেলার দাবাবোড়ের মত মরিত না—মানুষের মত হৃদয়ের সম্বন্ধ লইয়া, ধর্ম্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট্ আত্মহত্যার মত হইয়া দাঁড়াইত—এবং এইরূপ কাণ্ডকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন—"ইহা চমৎকার—কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে!" জাপান এই

চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক্, এইরূপই আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধদ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং অনাবশ্যক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ;—আপিসের মধ্যেই তাহার শেষ। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কাজ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনোপ্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে পুত্রকন্যার বিবাহ এবং শ্রাদ্ধশান্তি পর্য্যন্ত টানিয়া-লইয়া যাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন্। আমি রাজশাহী ও ঢাকার প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এই কন্‌ফারেন্স্-ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই—কিন্তু আশ্চর্য্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই সুপরিস্ফুট। যেন বরযাত্রীদল গিয়াছি—আহার-বিহার-আরাম-আমোদের জন্য দাবী ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বানকর্ত্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাঁহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই—এত চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়, এত শয়নাসন, এত লেমনেড্-সোডাওয়াটার-গাড়িঘোড়া, এত রসদের দায় আমাদের 'পরে কেন—তবে কথটা অন্যায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাঁকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে যত ভয়ঙ্কর কেজো হইয়া উঠি না কেন, তবু আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে

বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কন্‌ফারেন্সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই,—আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কন্‌ফারেন্স্ তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারিগণ আহূতবর্গকে অতিথিভাবে, আত্মীয়ভাবে সংবর্দ্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কি-পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যে অংশ আতিথ্য, সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পূরা কাজ করে— যে অংশ কেজো, তিনদিনমাত্র তাহার কাজ, বাকি বৎসরটা তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে সেবার সম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অনুশীলনের উপলক্ষ্য ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথ্য গৃহে গৃহে আচরিত হয়, তাহাকে বৃহৎ-পরিতৃপ্তি দিবার জন্য পুরাকালে বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান হইত—এখন বহুদিন হইতে সে সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া যেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া জনসমাগম হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অব্যবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞভাণ্ডারের মাঝখানে তাঁহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এম্‌নি করিয়া কন্‌গ্রেস্-কন্‌ফারেন্সের মাঝখানে খুব যখন বিলাতী বক্তৃতার ধুম ও চট্‌পটা করতালি—সেখানেও, সেই ঘোরতর সভাস্থলেও আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতঃমুখ তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন, সকলকে ভাঙিয়া, বাঁটিয়া, খাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কি করা হইতেছে, তাহা তিনি ভাল বুঝিতেই পারেন না।

মা'র মুখের হাসি আরো একটুখানি ফুটিত,—যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজ্ঞের ন্যায় এই সকল আধুনিক যজ্ঞে কেবল বইপড়া লোক নয়, কেবল ঘড়িচেনধারী লোক নয়—আহূত-অনাহূত আপামরসাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত—কিন্তু আনন্দে-মঙ্গলে ও মাতার আশীর্ব্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহাই হউক্, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধুর্য্যটুকু ভুলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে।

আমরা এই সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে-পরে, উচ্চে-নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ দেশে টোল, পাঠশালা, জলাশয়, অতিথিশালা, দেবালয়, অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান, জলদান, আশ্রয়দান, স্বাস্থ্যদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্ত্তব্য ছিন্নসমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্রসম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যাহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব? প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প—একমুষ্টি বা অর্দ্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই—এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্থার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষসম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না? স্বদেশের সহিত আমাদেরমঙ্গলসম্বন্ধ,—সে কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না? আমরা কি স্বদেশকে জলদান-বিষ্ঠাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্ম্মগুলিকে পরের হাতে বিদায়দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব? গবর্মেণ্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্টনিবারণের জন্ত পঞ্চাশহাজার টাকা দিতেছেন—মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশলক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না—তাহার ফল কি হইল? তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের সূত্রে, দেশের যে হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে, সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি—কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে? এইজন্তই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে

দেশকে অন্তরে-বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা ? ইহা কদাচই হইতে পারে না! ইহা কখনই চিরদিন এদেশে প্রশ্রয় পাইবে না—কারণ, ইহা ভারত-বর্ষের ধর্ম্ম নহে! আমরা আমাদের অতি দূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়-দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই—তাহা-দিগকেও নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি; আমাদের বহুকষ্ট-অর্জ্জিত অন্নও বহুদূর কুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা একদিনের জন্যও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই—আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না ? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্ত্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মত না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব ? কদাচ নহে—কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকে এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম্ম! এইবার সময় আসিয়াছে,—যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে,—যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি,—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতম-কেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না!

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধদ্বারা খুব বড় জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোট পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়—দেশকে আমরা কখনই পল্লীর মত করিয়া দেখিতে পারি না—এইজন্য অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না—কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিষটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে

আনাইতে হইবে এবং কারখানাঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইন-কানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসঙ্গত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশীই হোক্ না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতালাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতেই হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

পূর্ব্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল হইতে বাধ্য হইয়া পল্লিসমাজই খণ্ডখণ্ড ভাবে আপনার কাজ আপনি সম্পন্ন করিয়াছে—স্বদেশী সমাজ তেমন ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্ত্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আজো আমাদের মনুষ্যত্ব আছে—কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে আমা-দের চরিত্রে সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে। সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে, এইজন্য, যাহা ভাঙিয়াছে,

তাহার জন্য আমরা শোক করিব না—যাহা গড়িতে হইবে, তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আজকাল জড়ভাবে, যথেচ্ছাক্রমে, দায়ে পড়িয়া, যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে, তাহাই ঘটিতে দেওয়া কখনই আমাদের শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

এক্ষণে, আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ কর, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কি করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকই আপনার কর্ত্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দ্দিষ্টপথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজে কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাকায় তাহা যদি-বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যতশক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সর্ব্বত্রই

নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিত-রূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা—সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা—তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভাল, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইঁহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবে। সমাজের সমস্ত-অভাব-মোচন, মঙ্গলকর্ম্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশীসমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড় বড় মঠ মন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার আশ্রয়-স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে-জলে-স্বাস্থ্যে-বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সাম্নে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্ত্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম একস্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে—কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

কি করিয়া কলের সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হয়, কি করিয়া রাজার সহিত স্বদেশের সংযোগসাধন করিতে হয়, জাপান তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একইকালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্ত্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব—আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশী-সমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষস্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষস্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষস্থান হইতে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে, একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেণ্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হৌক্, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি এই কান্নাকাটি বৃথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল? দেশকে খণ্ডিত করিলে যে

সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্ত দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভাল—কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার, স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্ত্তৃশক্তি কি থাকিবে না? সেই কর্ত্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ়-সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নির্জ্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্চ্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ আমাদিগকে উপাধি বিতরণ করিয়া থাকেন—কিন্তু সৎকর্ম্মের সাধুবাদ ও আশীর্ব্বাদ আমরা স্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধন্ত হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মত আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতা-দান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্ত উপলক্ষ্যে হিন্দুমুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া-দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্ত্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয় ত সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন,

কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন—নির্ব্বাচন করিব কি করিয়া, সবাই নির্ব্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে ত সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্ব্বক বিচারবিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনোকালে কাজে নাবা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত,—দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া-লইয়া লোককে নির্ব্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে—যেমন করিয়া হৌক্, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া-তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্যলোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে একদল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ-রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে—পূর্ব্ব হইতে হিসাব করিয়া, কল্পনা করিয়া আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব—সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান্ ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য

অপেক্ষা করে। যে শক্তি আপাতত যোগ্যলোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা-কলসের মত শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্যলোক না হইলেও সমাজের শক্তি—সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য্যবলে আপনাকে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানীর মত সমস্ত লাভলোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই—কিন্তু বড় ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে একএকটা বড়দিন আসে, সেইদিন বড়লোকের তলবে দেশের সমস্ত শালতামামি নিকাস বড়খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল। আপাতত আমাদের কাজ—দপ্তর তৈরি রাখা, কাজ চালাইতে থাকা; যেদিন মহাপুরুষ হিসাব তলব করিবেন, সেদিন অপ্রস্তুত হইয়া শির নত করিব না—দেখাইতে পারিব, জমার ঘরে একেবারে শূন্য নাই।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড় করিব, এত বড় লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়, তাহা নহে। কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড় করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড় লোকই তাঁহাকে বড় করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে—মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি, আমার এই প্রস্তাব যদি-বা অনেকে

অনুকূলভাবেও গ্রহণ করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এমন কি, প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষ, ত্রুটি ও স্খলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে থাকা আশ্চর্য্য নহে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। অদ্যকার সভামধ্যে আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই, এ কথা বলিলেও পাছে অহঙ্কার প্রকাশ করা হয়, এজন্য আমি কুণ্ঠিত আছি। আমি অদ্য যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে তাহা বলাইতে উদ্যত করিয়াছে। তাহা আমার কথা নহে—তাহা আমার সৃষ্টি নহে, তাহা আমাকর্ত্তৃক উচ্চারিতমাত্র। আপনারা এ শঙ্কামাত্র করিবেন না, আমি আমার অধিকার ও যোগ্যতার সীমা বিস্মৃত হইয়া স্বদেশীসমাজ-গঠনকার্য্যে নিজেকে অত্যুগ্রভাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব—আসুন্, আমরা মনকে প্রস্তুত করি,—ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া, কর্ম্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতিসূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জ্জনা-স্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শত-সহস্র-রক্তভৃষার্ত্ত-শিকড় সমেত হৃদয়ের অন্ধকার-গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্রবিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি—আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি—শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গলপ্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি—শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ধূপের পবিত্রগন্ধ উদ্গত হইতে থাক্—দেবতার অনিমেষ কল্যাণদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেশ আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক বলিয়া একবার অনুভব করুক্।

এই অভিষেকের পরে সমাজপতি যাহাকে তাঁহার চারিদিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, কি ভাবে সমাজের কার্য্যে সমাজকে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলিবার বিষয় নহে। নিঃসন্দেহ, যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের চিরন্তন সমাজপ্রকৃতির অনুগত, তাহাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে—স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি নূতনকে যথাস্থানে যথাযোগ্য আসনদান করিবেন। আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও দলবিশেষের হাত হইতে সর্ব্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্য করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে—সমস্ত কলরবকোলাহলের মধ্যে আপনার গৌরবে তাঁহাকে দৃঢ়-গম্ভীরভাবে অবিচলিত থাকিতে হইবে।

অতএব যাঁহাকে আমরা সমাজের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের দ্বারা বরণ করিব, তাঁহাকে একদিনের জন্যও আমরা সুখস্বচ্ছন্দতার আশা দিতে পারিব না। আমাদের যে উদ্ধত নব্যসমাজ কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সম্মত না হইয়া নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতেছে, সেই সমাজের সূচিমুখ-কণ্টক-খচিত ঈর্ষাসন্তপ্ত আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে, বিধাতা যেন তাঁহাকেপ্রচুর পরিমাণে বল ও সহিষ্ণুতা প্রদান করেন—তিনি যেন নিজের অন্তঃকরণের মধ্যেই শান্তি ও কর্ম্মের মধ্যেই পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন—সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন—ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূলব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে; তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাসস্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনি এই মুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে নূতনকালের সহিত আপনার পুরাতনের

আশ্চর্য্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি!

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্য্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্য্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্য্যেরা আদিম অষ্ট্রেলিয়ান্ বা আমেরিকগণের মত উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য্য উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্য্যসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর একবার সুদীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব আরো গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে—মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই এশিয়াব্যাপী ধর্ম্মপ্লাবনের সময় ভারতবর্ষে নানাজাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ-উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্ব্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা

করেন, নানা স্বতোবিরোধ-আত্মখণ্ডনসঙ্কুল এই হিন্দুধর্ম্মের, এই হিন্দুসমাজের ঐক্যটা কোন্‌খানে? সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। সুবৃহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেম্‌নি কঠিন—কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোট গোলকের গোলত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে, তাহারা ইহাকে চ্যাপ্টা বলিয়াই অনুভব করে। তেম্‌নি হিন্দুসমাজ নানা পরস্পর-অসঙ্গত বৈচিত্রকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যসূত্র নিগূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অঙ্গুলির দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাত-প্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের প্রক্রিয়া সর্ব্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান-সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল, যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানাস্থানে ধর্ম্ম ও আচার লইয়া যে সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে, শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন ত দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্যসাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম্ম, আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎসমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান,—তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে।

বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড় রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্য্যস্ততা ঘটিয়াছিল, তাহাতে পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে। নূতনত্ব ও পরিবর্ত্তনমাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা, আঘাতের আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবস্তও রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়—তাহা একপ্রকার জীবন্মৃত্যু।

বৌদ্ধপরবর্ত্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎপদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্ম্মে বিজ্ঞানে, দর্শনে, ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত, সকলদিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে;—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের

মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক্‌ দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র! আমরা ছিলাম বিশ্বের—দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্ম সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে, সেই শক্তিই, কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া-উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলঙ্কারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ্‌ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে, তাহা খোওয়াই যাইতেছে!

বস্তুত এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনো-কালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ্‌রূপে ছিল না—তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্ম্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচার পালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল—যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না,—সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব ঐশ্বর্য্য-বিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল, সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া-আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভারগ্রহণ করিল—তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু

দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল, তাহাকেও অকর্ম্মণ্য ও বিকৃতি করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাট্‌মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় কেবল ভারস্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত কেবল টিঁকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বারবাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্ব্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্ত্তিত্বের চেয়ে বড়।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁট্‌লি-পাঁট্‌লা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেকস্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেম্‌নি হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য! এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিষ আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি

ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কি আশ্চর্য্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরাজ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্বত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল "গেল গেল" বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও আমরা ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা, তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশে তাপসেরা তপস্যারদ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া

জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ-ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হোক্, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে,—লজ্জা দূর হইবে,—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে, তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মত গ্রহণ করিব, তাহা নহে,—ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন—তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। আমাদের ভারতের মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জন্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রকে একসীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন—মনস্তত্ত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া দাঁড় করাইবেন না, তাহা বলিতে পারি না। এই ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে

ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট্ একের মধ্যে সকলেরই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদ-নিরত ব্যবধানসঙ্কুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্ব্বে—"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" যে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া, আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর! আমরা কি এই জননীর জীর্ণগৃহ সংস্কার করিতে পারিব না? পাছে সাহেবের বাড়ীর বিল্ চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা-আস্বাব্-আড়ম্বরে কম্তি পড়ে, এইজন্যই, আমাদের যে মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন, পরের পাকশালার দ্বারে তাঁহারি অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ ত একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত,—একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্ম্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া ত কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত

হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম, কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল, তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে?—কখনই নহে! নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ডপ্রভাব ধীরভাবে, নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুই-চারিদিনের এই ইস্কুলের মুখস্থবিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের বক্ষঃকুহরকে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে;—এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" একবার স্বীকার কর, মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্য অদ্য আমরা প্রস্তুত হইলাম; একবার স্বীকার কর যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা কর, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া-দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকাল-কুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

"স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট।*

"স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জ্জন্ রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি, + তৎসম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য এ প্রশ্নগুলি তিনি আমার কাছে পাঠান নাই, হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্নোত্তরের মত লিখিতে গেলে লেখা নিতান্তই আদালতের সওয়াল-জবাবের মত হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ থাপ্‌ছাড়া লেখায় সকল কথা সুস্পষ্ট হয় না, এইজন্য সংক্ষিপ্ত-প্রবন্ধ-আকারে আমার কথাটা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি।

কর্ণ যখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখনি তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়াছিল; অর্জ্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই, তখনি তিনি সামান্য দস্যুর হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, শক্তি সকলের এক জায়গায় নাই—কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের সর্ব্বাঙ্গে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়।

য়ুরোপের যেখানে বল, আমাদের সেখানে বল নহে। য়ুরোপ

---

* ইহা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে বাহির হইয়া গেছে। কিন্তু "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেজন্য অনেকের আগ্রহে ও অনুরোধে এবং ইহার স্থায়িত্বসঙ্কল্পে উক্ত "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইল।—(সহঃ সঃ)

+ গত ৭ই শ্রাবণ শুক্রবার মিনার্ভারঙ্গমঞ্চে চৈতন্যলাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে প্রবন্ধটি প্রথম পঠিত হইয়াছিল। তাহার পর পরিবর্দ্ধিত আকারে ১৬ই শ্রাবণ রবিবার কর্জ্জনরঙ্গমঞ্চে ভাদ্রের বঙ্গদর্শন হইতে পুনঃপঠিত হয়।

আত্মরক্ষার জন্য যেখানে উদ্যম প্রয়োগ করে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সেখানে উদ্যমপ্রয়োগ বৃথা। য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার ষ্টেট্ অর্থাৎ সরকার। সেই ষ্টেট্ দেশের সমস্ত হিতকর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে—ষ্টেট্ই ভিক্ষাদান করে, ষ্টেট্ই বিদ্যাদান করে, ধর্ম্মরক্ষার ভারও ষ্টেটের উপর। অতএব এই ষ্টেটের শাসনকে সর্ব্বপ্রকারে সবল, কর্ম্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচনোই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।

আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্ম্মরূপে আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্ম্মকে, সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্ম্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা দুর্ব্বিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা অচেতনভাবে, মূঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরাজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে—সমাজটাকে নিতান্ত উপ্‌রিপাওনার মত লইতেছে—"ফাউ" বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখ। ইংরাজের আইন আমাদের সমাজ-রক্ষার ভার লইয়াছে। হয় ত যথার্থভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই বুঝিয়া খুসি থাকিলে চলিবে না। পূর্ব্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা অনুসারে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। তাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় যাহারা করিত, তাহারা স্বতন্ত্রসম্প্র-

দায়িরূপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন না, হিন্দুসমাজে আচারবিচারের কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবস্থার গুণে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই। কোনো অংশে কোনো দল পৃথক্ হইতে গেলেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন হইতে হয়। পূর্ব্বে এরূপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তখন সমাজ এরূপ সবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া টিঁকিয়া থাকা সহজ ছিল না। সুতরাং যে দল কোনো পার্থক্য অবলম্বন করিত, সে উদ্ধতভাবে বাহির হইয়া যাইত না। সমাজও নিজের শক্তিসম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল বলিয়াই অবশেষে ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া পৃথক্‌পন্থাবলম্বীকে যথাযোগ্যভাবে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

এখন যে দল একটু পৃথক্ হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরাজের আইন কোন্‌টা হিন্দু, কোন্‌টা অহিন্দু, তাহা স্থির করিবার ভার লইয়াছে—রফা করিবার ভার ইংরাজের হাতে নাই; সমাজের হাতেও নাই। তাহার কারণ, পৃথক্ হওয়ার দরুণ কাহারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—ইংরাজরচিত স্বতন্ত্র আইনের আশ্রয়ে কাহারো কিছুতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব এখন হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র ত্যাগ করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।

আক্কেলদাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, তখন বেদনায় অস্থির করে। কিন্তু যখন সে উঠিয়া পড়ে, তখন শরীর তাহাকে সুস্থভাবে রক্ষা করে। যদি দাঁত উঠিবার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া দাঁতগুলাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই শরীর সাব্যস্ত করে, তবে বুঝিব, তাহার অবস্থা ভাল নহে,—বুঝিব, তাহার শক্তিহীনতা ঘটিয়াছে।

সেইরূপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নূতন অভ্যুদয়কে স্বকীয় করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জ্জন করিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য হওয়া সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে। এবং এই বর্জ্জন করিবার জন্য ইংরাজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যার উপায়।

যেখানেই সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে, সেখানে যে কেবল নিজেকে ছোট করিতেছে, তাহা নহে—ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তরথীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িবে। কেবলি খোয়াইতে থাকিব, এই যদি আমাদের অবস্থা হয়, তবে নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের এ দশা ছিল না। আমরা খোওয়াই নাই, আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমস্ত রক্ষা করিয়াছি—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব, ইহাই আমাদের বল।

শুধু এই নয়, কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া, আমরা ইংরাজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারো অগোচর নাই। যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিস্‌ম্যান্ ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবাররক্ষার চেষ্টা কেন ? সেদিন বনবাসই শ্রেয়।

মুসলমানসমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং খৃষ্টানসমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মত ধাক্কা দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ সমস্যাটা ছিল না। যদি থাকিত, তবে তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত এই সকল পরসমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন—এমনভাবে করিতেন, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথায় কথায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে দ্বন্দ্ব

বাধিয়া উঠিতেছে, এই দ্বন্দ্ব—অশান্তি, অব্যবস্থা ও দুর্ব্বলতার কারণ।

যেখানে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব বাধিতেছে না, সেখানে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পরের সঙ্গে আপনার সীমানানির্ণয়সম্বন্ধে কোনো কর্ত্তৃত্বপ্রকাশ করিতেছে না; নিজের ক্ষয়নিবারণের প্রতিও তাহার কর্ত্তৃত্ব জাগ্রত নাই। যাহা আপনি হইতেছে, তাহাই হইতেছে; —যখন ব্যাপারটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পরিস্ফুট হইতেছে, তখন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিলাপে কেহ বন্যাকে ঠেকাইতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাও বিলাপ নহে।

বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী সভ্যতা আমাদের মনকে, আমাদের বুদ্ধিকে যদি অভিভূত করিয়া না ফেলিত, তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে বসিত না।

গুরুতর রোগে যখন রোগীর মস্তিষ্ক বিকল হয়, তখনি ডাক্তার ভয় পায়। তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ-প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা, তাহা মস্তিষ্কই করিয়া থাকেন—সে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন বৈদ্যের ঔষধ তাহার সর্ব্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মস্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্ম সমর্পণ করে, তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কি করিয়া?

এইরূপে বিদেশীশিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিতলোক হৃদয়মনকে অভিভূত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা

প্রহসনে পরিহাস করে। কিন্তু শান্তভাবে কেন বিচার করে না যে,—কেন এমনটা ঘটিতেছে ?

ডাক্তাররা বলেন, শরীর যখন সবল ও সক্রিয় থাকে, তখন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় সর্দ্দিকাশি-ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায়।

বিলাতিসভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। স্বস্থানে সকল জিনিষই ভাল, অস্থানে পতিত ভাল জিনিষও জঞ্জাল। চোখের কাজল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে। আমার উপমার ইহাই কৈফিয়ৎ।

যাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ-সক্রিয় থাকিত, তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজ যখন তাহার কলবল, তাহার বিজ্ঞানদর্শন লইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। যে তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল, সেই তপস্যা তখন ক্ষান্ত ছিল। আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পুঁথি রৌদ্রে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা কিছুই করিতেছিলাম না। আমাদের গৌরবের দিন বহুদূর পশ্চাতে দিগন্তরেখায় ছায়ার মত দেখা যাইতেছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীর পাড়িও সেই পর্ব্বতমালার চেয়ে বৃহৎরূপে, সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়!

যাহা হউক, আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট-নিষ্ক্রিয়, সেই সময়ে একটা সচেষ্ট-শক্তি, শুষ্ক জ্যৈষ্ঠের সম্মুখে আষাঢ়ের মেঘাগমের ন্যায় তাহার বজ্রবিদ্যুৎ, বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্ত বেষ্টন করিয়া দেখা দিল। ইহাতে অভিভূত করিবে না কেন ?

আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে

জাগ্রত করা। আমরা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া-বসিয়া ফুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের গৌরব নহে; আমরা সেই ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই যখন সমাজের সর্ব্বত্র আমরা উপলব্ধি করিব, তখনি নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্চাত হইয়া আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে।

আমাদের এই নিষ্ক্রিয়-নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন ঘটিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। তাহার কারণ ভীরুতা। আমাদের যাহা-কিছু ছিল, তাহারই মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশীসভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

কিন্তু প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম সুপ্তিভঙ্গে যে প্রখর আলোক চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগভাবে, সজ্ঞানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎভাবে, প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি।

এখন এই আদর্শকে কি করিয়া বাঁচানো যাইবে, সেই ব্যাকুলতা নানাপন্থানুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। যেমন আছি, ঠিক তেম্‌নি বসিয়া থাকিলেই যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমদের এমন দুর্গতি ঘটিত না।

আমি যে ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মৎলব মনে মনে আঁটিয়াছি, বঙ্গবাসীর কোনো কোনো লেখক এরূপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন। আমার বুদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা, আশা করি, অন্য দশজনের ততদূর না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণহস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে? প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিব! যদি এমন মৎলবই আমার থাকিবে, তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা

কেন? কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে মনে ভূমিকম্পসৃষ্টির মৎলব আছে শঙ্কা করিয়া কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে?

ব্যবস্থাবুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষ বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করে, এ কথার অর্থ ইহা হইতেই পারে না, ভারতবর্ষ ষ্টীম্‌রোলার্ বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম, সমতল করিয়া দেয়। বিলাত পরকে বিনাশ করাই, পরকে দূর করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে, ভারতবর্ষ পরকে আপন করাই আত্মসার্থকতা বলিয়া জানে। এই বিচিত্রকে এক করা, পরকে আপন করা যে একাকার নহে, পরন্তু পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, এ কথা কি আমাদের দেশেও চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে? আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি—আমরাও যদি [illegible]শব্দটি শুনিলেই, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই অমনি হাঁহাঃশব্দে লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে বুঝিব, পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই লক্ষ্মীছাড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ নিয়ত কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে—ইহার রক্ষাদেবতা,—যিনি সহাস্যমুখে সকলকে ডাকিয়া-আনিয়া সকলকে প্রসাদের ভাগ দিয়া অতি নিঃশব্দে, অতি নিরুপদ্রবে ইহাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন,—তিনি কখন্ ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইবেন, তাহারই অবসর খুঁজিতেছেন।

গোস্বামি মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—আমি যেখানে নূতন নূতন যাত্রাকথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করিয়াছি, সেস্থলে "নূতন" কথাটার তাৎপর্য্য কি? পুরাতনই যথেষ্ট নহে কেন?

রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড

পর্য্যন্ত ছয়কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নূতন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।

আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরো একটি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা, সাধু, পিতা, গুরু, ভাই, ভৃত্যের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব; সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে, ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে?

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সমুদ্রযাত্রার আমি সমর্থন করি কি না; যদি করি, তবে হিন্দুধর্ম্মানুগত আচারপালনের বিধি রাখিতে হইবে কি না?

এ সম্বন্ধে কথা এই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম্ম বলি না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সমস্ত কথাকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া আমি অনাবশ্যক জ্ঞান করি। কারণ, আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আমার মতেই সমাজগঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোন উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন্ কিরূপ হইবে আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রসঙ্গক্রমে আমি দুচারিটা কথা যাহা বলিয়াছি, অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তাহার বিচার করিতে বসা মিথ্যা। আমি যদি সুপ্ত প্রহরীকে ডাকিয়া বলি—"ভাই, তোমার

হীরামুক্তার দোকান সাম্‌লাও," তখন কি সে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণরচনার গঠনসম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে, অতএব আমার কথা কর্ণপাতের যোগ্য নহে? তোমার কঙ্কণ তুমি যেমন খুসি গড়িয়ো, তাহা লইয়া তোমাতে-আমাতে হয়ত চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোখে জল দিয়া ধৌত কর, তোমার হীরামুক্তার পসরা সাম্‌লাও—দস্যুর সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যখন অসাড়-অচেতন হইয়া দ্বার জুড়িয়া পড়িয়া আছ, তখন তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাটি একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিতেছে না।

সফলতার সদুপায়।*

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজরাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন-প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাটবাজারের সৃষ্টি করে, যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী

---

* প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষা চালাইবার কথা হইয়াছিল, তখন এই প্রবন্ধ রচিত হয়। সম্প্রতি সে সঙ্কল্প বন্ধ হওয়াতে প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বাদ দেওয়া গেল।

রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশশাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্য পক্ষের ভালো কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম্ম, সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ধর্ম্ম নষ্ট হয়—এবং—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই একপক্ষের সুবিধা কোনোমতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্য্যয় আপনিই ঘটাইবে; নিরস্ত্র, নিঃসত্ত্ব, নিরন্ন ভারতের দুর্ব্বলতাই ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতিকে বড় করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্পলোকের আছে। বিশেষত লোভ যখন বেশি হয়, তখন দেখিবার শক্তি আরো কমিয়া যায়। ভারতবর্ষকে চিরকালই আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিব, অত্যন্ত লুব্ধভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন, তবে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই নয়, তাহা জগতের নিয়মবিরুদ্ধ—ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়—চিরদিন বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে বস্তুত যতদিন রাখা সম্ভব হইত, তাহাকেও হ্রস্ব করিতে হয়।

অধীন দেশকে দুর্ব্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জ্জীব করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি, যে সময়ে ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলি, কীট্‌স্,

টেনিসন্, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপ্লিং হইয়াছেন কবি ; যে সময়ে কার্লাইল, রাস্কিন্, ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ আর নাই, একমাত্র মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন ; যে গ্ল্যাড্ষ্টোনের বজ্রগম্ভীর বাণী নীরব এবং চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত ; যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে ভুবনমোহন ফুল ফোটে না,—একমাত্র পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে ; যে সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্ব্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে ; যে সময়ে বীর্য্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও দুঃসময় বলিব কি না বলিব, তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের পরিচয় দুঃখের দিনেই ভাল করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় ব্যতীত কোনো জাতির কোনোকালে উদ্ধার নাই। যাহা নিজে করিতে হয়, তাহা দরখাস্ত দ্বারা হয় না ; যাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক, তাহার জন্য বাক্যব্যয় করিলে কোনো ফল নাই ; এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্যই বিধাতা দুঃখ দিয়া থাকেন। যতদিন ইহা না বুঝিব, ততদিন দুঃখ হইতে দুঃখে, অপমান হইতে অপমানে বারংবার অভিহিত হইতেই হইবে।

প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোনো আশঙ্কা মনে রাখিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, সে আশঙ্কা কিরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দূর করিতে পারি, সভাস্থলে কি এমন বাক্যের ইন্দ্রজাল আমরা সৃষ্টি করিব,—যাহার দ্বারা তাঁহারা এক মুহূর্ত্তে আশ্বস্ত হইবেন ? আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজ অনন্ত

কাল আমাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রেয়? যদি বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্ব্বাচীন যে এমন কথায় মুহূর্ত্তকালের জন্ম শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে পারিবে? আমাদিগকে এ কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, যে পর্য্যন্ত না আমাদের নানাজাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থভাবে, স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয়, সে পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু পরদিনেই আর নহে।

এমন স্থলে ইংরেজ যদি মমতায় মুগ্ধ হইয়া, যদি ইংরেজি জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকাইয়া—সেই স্বার্থকে যত বড় নামই দাও না কেন, না হয় তাহাকে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মই বল—যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারতরাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরস্থায়ী করিব, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক হইতে দিবার নীতি অবলম্বন করিব না, তবে নিরতিশয় উচ্চঅঙ্গের ধর্ম্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কি জবাব আছে? এ কথাটা যে সত্য যে, আমাদের দেশে সাহিত্য ক্রমশই প্রাণবান্‌- বলবান্‌ হইয়া উঠিতেছে; এই সাহিত্য ক্রমশই অল্পে অল্পে সমাজের উচ্চ হইতে নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে; যে সকল জ্ঞান, যে সকল ভাব কেবল ইংরাজিশিক্ষিতদের মধ্যেই বদ্ধ ছিল, তাহা আপামরসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইতেছে; এই উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্তদেশের ভাবনা, বেদনা, লক্ষ্য এক হইয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; এক সময়ে যে সকল কথা কেবল বিদেশী পাঠশালের মুখস্থকথামাত্র ছিল, এখন তাহা দিনে দিনে স্বদেশের ভাষায়, স্বদেশের সাহিত্যে স্বদেশের আপন কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে! আমরা কি বলিতে পারি, না, তাহা হইতেছে না, এবং বলিলেও কি তাহাতে কাহারো চোখে ধূলা দেওয়া হইবে? জলন্ত দীপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে, না, তাহার আলো নাই?

এমন অবস্থায় ইংরেজ যদি এই উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের ঐক্যস্রোতকে অন্তত চারটে বড় বড় বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া নিশ্চল ও নিস্তেজ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা কি বলিতে পারি? আমরা এই বলিতে পারি যে, এমন করিলে যে ক্রমশ আমাদের ভাষার উন্নতি প্রতিহত এবং আমাদের সাহিত্য নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে। যখন বাংলাদেশকে দুই অংশে ভাগ করিবার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল, তখনো আমরা বলিয়াছিলাম, এমন করিলে যে আমাদের মধ্যে প্রভেদ উত্তরোত্তর পরিণত ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কাঠুরিয়া যখন বনস্পতির ডাল কাটে, তখন যদি বনস্পতি বলে, আহা কি করিতেছ, অমন করিলে যে আমার ডালগুলা যাইবে! তবে কাঠুরিয়ার জবাব এই যে, ডাল কাটিলে যে ডাল কাটা পড়ে, তাহা কি আমি জানি না, আমি কি শিশু! কিন্তু তবুও তর্কের উপরেই ভরসা রাখিতে হইবে?

আমরা জানি, পার্লামেন্টেও তর্ক হয়, সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষের জবাব দেয়; সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিল বলিয়া খুসি হয়। আমরা কোনোমতেই ভুলিতে পারি না,—এখানেও ফললাভের উপায় সেই একই।

কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না। সেখানে দুই পক্ষই যে বামহাত-ডানহাতের ন্যায় একই শরীরের অঙ্গ। তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই। আমরাও কি তেম্নি একই? গবর্মেণ্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা যেখানে, আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে? তাঁহারা যে ডাল নাড়া দিলে যে ফল পড়ে, আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়ো না; এ সম্বন্ধে মিল্ কি বলিয়াছেন, স্পেন্সর্ কি বলিয়াছেন, সীলি কি বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার শিকিপয়সার লাভ নাই। প্রত্যক্ষ শাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে। খুব বেশিদূর তলা-

হইবার দরকার নাই, নিজের মনের মধ্যেই একবার দৃষ্টিপাত কর না। যখন য়ুনিভার্সিটি-বিল লইয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তখন আমরা কিরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম? আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, গবর্মেণ্ট আমাদের বিদ্যার উন্নতিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেনএরূপ করিতেছেন? কারণ লেখাপড়া শিখিয়া আমরা শাসনসম্বন্ধে অসন্তোষ অনুভব করিতে এবং প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি। মনেই কর, আমাদের এ সন্দেহ ভুল, কিন্তু তবু ইহা জন্মিয়াছিল, তাহাতে ভুল নাই।

যে দেশে পার্লামেণ্ট আছে, সে দেশেও এডুকেশন্ বিল লইয়া ঘোরতর বাদবিবাদ চলিয়াছিল—কিন্তু দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি-কোনো লোক স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করিতে পারিত যে, যেহেতু শিক্ষা-লাভের একটা অনিবার্য্য ফল এই যে, ইহার দ্বারা লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে, নিজের শক্তিসম্বন্ধে তাহার সচেতন হইয়া ওঠে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে সে ব্যগ্র হয়, অতএব এত-বড় বালাইকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। কখনই নহে, উভয় পক্ষই এই কথা মনে করিয়াছিল যে, দেশের মঙ্গলসাধনসম্বন্ধে পরস্পর ভ্রমে পড়িয়াছে। ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবামাত্র তাহার ফল হাতে-হাতে, অতএব সেখানে তর্ক করা এবং কার্য্য করা একই।

আমাদের দেশে সে কথা খাটে না। কারণ, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম এবং আমরা কর্ত্তা নহি! তার্কিক বলিয়া থাকেন—"সে কি কথা! আমরা যে বহুকোটি টাকা সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর, আমদের কর্তৃত্ব থাকিবে না কেন! আমরা এই টাকার হিসাব তলব করিব।" গোরু যে নন্দ-নন্দনকে দুইবেলা দুধ দেয়, সেই দুধ খাইয়া নন্দনন্দন যে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন,

গোরু কেন শিং নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হইতে দুধের হিসাব তলব না করে! কেন যে না করে, তাহা গোরুর অন্তরাত্মাই জানে এবং তাহার অন্তর্যামীই জানেন।

শাদা কথা এই যে, অবস্থাভেদে উপায়ের ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মনে কর না কেন, ফরাসিরাষ্ট্রের নিকট হইতে ইংরেজ যদি কোনো সুবিধা আদায়ের মৎলব করে, তবে ফরাসি-প্রেসিডেণ্ট্‌কে তর্কে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করে না, এমন কি, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশও শোনায় না—তখন ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য তাহাকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়—এই জন্যই কৌশলী রাজদূত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা যায়, একদা জর্ম্মণি যখন ইংলণ্ডের বন্ধু ছিল, তখন ডিউক-উপাধিধারী ইংরেজরাজদূত ভোজনসভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জর্ম্মণ্‌রাজের হাতে তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল, যে দিন মোগলসভায়, নবাবের দরবারে ইংরেজকে বহু তোষামোদ, বহু অর্থব্যয়, বহু গুপ্তকৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গায়ের জ্বালা যে তাঁহাদিগকে আশ্চর্য্য প্রসন্নতার সহিত গায়েই মিলাইতে হইয়াছিল, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। পরের সঙ্গে সুযোগের ব্যবসায় করিতে গেলে ইহা অবশ্যম্ভাবী।

আর, আমাদের দেশে আমাদের মত নিরুপায় জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা দেখিতে হয়, তবে কি আন্দোলনের দ্বারাতেই তাহা সফল হইবে? যে দুধের মধ্যে মাখন আছে, সেই দুধে আন্দোলন করিলে মাখন উঠিয়া পড়ে; কিন্তু মাখনের দুধ রহিল গোয়াল বাড়ীতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম, ইহাতেও কি মাখন জুটিবে? যাঁহারা পুঁথিপন্থী, তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিলেন—আমরা ত কোনোরূপ

সুযোগ চাই না, আমরা ন্যায্য অধিকার চাই। আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। মনে কর, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ন্যায্যস্বত্বও যে দখলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গবর্মেণ্ট বলিতে ত একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পশ্চাতে যে রক্তমাংসের মানুষ আছে—তাঁহারা যে ন্যূনাধিকপরিমাণে ষড়্রিপুর বশীভূত। তাঁহারা রাগদ্বেষের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবন্মুক্ত হইয়া এদেশে আসেন নাই। তাঁহারা অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অন্যায়সংশোধনের সুন্দর উপায় এমন কথা কেহ বলিবেন না। এমন কি, যেখানে আইনের তর্ক ধরিয়াই কাজ হয়, সেই আদালতের উকিল শুদ্ধমাত্র তর্কের জোর ফলাইতে সাহস করেন না, জজের মন বুঝিয়া অনেক সময় ভাল তর্কও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, অনেক সময় বিচারকের কাছে মৌখিক পরাভব স্বীকারও করিতে হয়—তাহার কারণ, জজ্ ত আইনের পুঁথিমাত্র নহেন, তিনি সজীব মনুষ্য। যিনি আইন প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে যদি এত বাঁচাইয়া চলিতে হয়, যিনি আইন সৃষ্টি করিবেন, তাঁহার মনুষ্যস্বভাবের প্রতি কি একেবারে দৃক্পাত করাও প্রয়োজন হইবে না?

কিন্তু আমাদের যে কি ব্যবস্থা, কি উদ্দেশ্য এবং কি উপায়, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন জয়লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিক্সে সেইরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধিটাই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা যদি-বা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে কথাটাকে আমল দিই না। মনে করি, আমাদের পোলিটিক্যাল্ কর্ত্তব্যক্ষেত্র যেন স্কুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব্—গবর্মেণ্ট্ যেন আমাদের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি সুন্দর হইয়াও যেরূপ রোগী মরে, আমাদের এখানেও বক্তৃতা

অতি চমৎকার হইয়াও কার্য্য নষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখিতেছি।

কিন্তু আমি আজ আমার দেশের লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি—আমার যা-কিছু বক্তব্য, সে তাঁহাদেরই প্রতি। তাঁহাদের কাছে মনের কথা বলিবার এই একটা উপলক্ষ্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। নহিলে, এই সমস্ত বাদবিবাদের উন্মাদনা, এই সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে আমার একদিনের জন্যও উৎসাহ হয় না। জীবনের প্রদীপটিতে যদি আলোক জ্বালাইতে হয়, তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ার মুখে চলে? আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন—ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে। যে অবিচলিত অবকাশ এবং অক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ও অঙ্কুর দিনে দিনে বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহা সম্প্রতি আমাদের দেশে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। ছোট ছোট আঘাত নানাদিক্ হইতে আসিয়া পড়ে—হাতে-হাতে প্রতিশোধ বা উপস্থিত প্রতিকারের জন্য দেশের মধ্যে ব্যস্ততা জন্মে, সেই চতুর্দ্দিকে ব্যস্ততার চাঞ্চল্য হইতে নিজেকে রক্ষা করা কঠিন। রোগের সময় যখন হঠাৎ এখানে বেদনা, ওখানে দাহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন তখনি-তখনি সেটা নিবারণের জন্য রোগী অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে না। যদিও জানে অস্থিরতা বৃথা, জানে এই সমস্ত স্থানিক ও সাময়িক জ্বালাযন্ত্রণার মূলে যে ব্যাধি আছে, তাহার ঔষধ চাই এবং তাহার উপশম হইতে সময়ের প্রয়োজন, তবু চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরাও তেম্নি প্রত্যেক তাড়নার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অস্থির হইয়া মূলগত প্রতিকারের প্রতি অমনোযোগী হই। সেই অস্থিরতায় আজ আমাকে এখানে আকর্ষণ করে নাই—কর্ত্তৃপক্ষের বর্ত্তমান প্রস্তাবকে

অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের যে ক্ষণিক বৃথাতৃপ্তি, তাহাই ভোগ করিবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হই নাই, আমি দুটো-একটা গোড়ার কথা স্বদেশীলোকের কাছে উত্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া এই সভায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। যে জাতীয় কথাটা লইয়া আমাদের সম্প্রতি ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে বারংবার ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃহৎ আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাবিধিঘটিত আক্ষেপটাকে আমি সামান্য উপলক্ষ্যস্বরূপ করিয়া তাহার বিপুল আধার-ক্ষেত্রটাকে আমি প্রধানভাবে লক্ষ্যগোচর করিবার যদি চেষ্টা করি, তবে দয়া করিয়া আমার প্রতি সকলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন না।

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি কোন্‌দিন কিরূপ ব্যবহা করিলেন, তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দিই না। আমি জানি, প্রত্যেকবার মেঘ ডাকিলেই বজ্র পড়িবার ভয়ে অস্থির হইয়া বেড়াইলে কোনো লাভ নাই। প্রথমত বজ্র পড়িতেও পারে, না-ও পড়িতে পারে; দ্বিতীয়ত যেখানে বজ্রপড়ার আয়োজন হইতেছে, সেখানে আমার গতিবিধি নাই, আমার পরামর্শ প্রতিবাদ বা প্রার্থনা সেখানে স্থান পায় না; তৃতীয়ত বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে, তবে সে উপায় ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের পাল্টা জবাব দেওয়া নহে, সে উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার দ্বারাই লভ্য; যেখান হইতে বজ্র পড়ে, সেইখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিবারণের তাম্রদণ্ডটাও নামিয়া আসে না, সেটা শান্তভাবে বিচারপূর্ব্বক নিজেকেই রচনা করিতে হয়।

বস্তুত আজ যে পোলিটিকাল্ প্রসঙ্গ লইয়া এ সভায় উপস্থিত

হইয়াছি, সেটা হয় ত সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ—কিন্তু কাল আবার আর-একটা কিছু মারাত্মক ব্যাপার উঠিয়া পড়া আশ্চর্য্য নহে। ঘড়ি-ঘড়ি এমন কতবার ছুটাছুটি করিতে হইবে? আজ যাহার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিলাম, তিনি সাড়া দিলেন না—অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম, ইহার মেয়াদ ফুরাইলে যিনি আসিবেন,—তাঁহার যদি দয়ামায়া থাকে। তিনি যদি-বা দয়া করেন, তবু আশ্বস্ত হইবার যো নাই, আর-এক ব্যক্তি আসিয়া দয়ালুর দান কানে ধরিয়া আদায় করিয়া তাহার হাত-নাগাদ সুদসুদ্ধ কাটিয়া লইতে পারেন। এতবড় অনিশ্চয়ের উপরে আমাদের সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করা যায়?

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোপ চলে না। "সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে আমার পাখা পোড়ানো উচিত নয়" বলিয়া পতঙ্গ যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাখা পুড়িবে। সে স্থলে ধর্ম্মের কথা আওড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া আগুনকে দূর হইতে নমস্কার করাই তাহার কর্ত্তব্য হইবে। ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিবে, আমাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে, সেখানেই তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক দুটো পেরেক ঠুকিয়া দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে—আমরা সূক্ষ্ম তর্ক করিতে এবং নিখুঁৎ ইংরাজি বলিতে পারি বলিয়াই যে ইহার অন্যথা হইবে, তা হইবে না। এরূপ স্থলে আর যাই হোক্, রাগারাগি করা চলে না।

মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উঠিতে পারে না যে তাহা নহে, কিন্তু সেটাকে প্রাত্যহিক হিসাবের মধ্যে আনিয়া ব্যবসা করা চলে না। হাতের কাছে একটাদৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। সেদিন কাগজে পড়িয়াছিলাম, ডাক্তার চন্দ্র খৃষ্টানমিশনে লাখখানেক টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—আইনঘটিত ত্রুটি থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে

মিশন্ সেই টাকা পাওয়ার অধিকার হারাইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার চন্দ্রের হিন্দু ভ্রাতা আইনের বিরূপতাসত্ত্বেও তাঁহার ভ্রাতার অভিপ্রায় স্মরণ করিয়া এই লাখটাকা মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃসত্য রক্ষা করিয়াছেন। যদি না করিতেন, যদি বলিতেন, আমি হিন্দু হইয়া খৃষ্টানধর্ম্মের উন্নতির জন্য টাকা দিব কেন—আইনমতে যাহা আমার, তাহা আমি ছাড়িব না। এ কথা বলিলে তাঁহাকে নিন্দা করিবার জো থাকিত না, কারণ সাধারণত আইন বাঁচাইয়া চলিলেই সমাজ নীরব থাকে। কিন্তু আইনের উপরেও যে ধর্ম্ম আছে, সেখানে সমাজের কোন দাবী খাটে না, সেখানে যিনি যান, তিনি নিজের স্বাধীন মহত্ত্বের জোরে যান, মহত্তের গৌরবই তাই; তাঁহার ওজনে সাধারণকে পরিমাণ করা চলে না।

ইংরেজ যদি বলিত, জিতদেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে সকল সর্ব্বসম্মত অধিকার আছে, তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব, কারণ, ইহারা বেশ ভাল বাগ্মী,—যদি বলিত, বিজিত পরদেশীসম্বন্ধে অল্পসংখ্যক বিজেতা স্বাভাবিক-আশঙ্কা-বশত যে সকল সতর্কতার কঠোর ব্যবস্থা করে, তাহা আমরা করিব না; যদি বলিত, আমাদের স্বদেশে স্বজাতির কাছে আমাদের গবর্মেণ্ট সকল বিষয়ে যেরূপ খোলসা জবাবদিহি করিতে বাধ্য, এখানেও সেরূপ সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতা স্বীকার করিব; সেখানে সরকারের কোনো ভ্রম হইলে তাহাকে যেরূপ প্রকাশ্যে তাহা সংশোধন করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে; এদেশ কোনো অংশেই আমাদের নহে, ইহা সম্পূর্ণই এ দেশবাসীর, আমরা যেন কেবলমাত্র খবরদারি করিতে আসিয়াছি, এম্‌নিতর নিরাসক্তভাবে কাজ করিয়া যাইব, তবে আমাদের মত লোককে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে হইত, তোমরা অত্যন্ত মহৎ, আমরা তোমাদের তুলনায় এত অধম যে, এ দেশে যতকাল তোমাদের পদধূলি পড়িবে, ততকাল

আমরা ধন্য হইয়া থাকিব। অতএব তোমরা আমাদের হইয়া পাহারা দাও, আমরা নিদ্রা দিই, তোমরা আমাদের হইয়া মূলধন খাটাও এবং তাহার লাভটা আমাদের তহবিলে জমা হইতে থাক্, আমরা মুড়ি খাই, তোমরা চাহিয়া দেখ, অথবা তোমরা চাহিয়া দেখ, আমরা মুড়ি খাইতে থাকি। কিন্তু ইংরেজ এত মহৎ নয় বলিয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না, বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। দূরব্যাপী পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে মানুষের হিসাবে বিচার করিলেই কাজে লাগে—সেই হিসাবে যা পাই সেই ভাল, তাহার উপরে যাহা জোটে সেটা নিতান্তই উপরি-পাওনা, তাহার জন্য আদালতে দাবী চলে না, এবং কেবলমাত্র "ফাকি. দিয়া" সেরূপ উপরি পাওনা যাহার নিয়তই জোটে, তাহাকে দুর্গতি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোট। সুদূর য়ুরোপের নিত্যলীলাময় সুবৃহৎ পোলিটিকাল্ রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিতেছে—ফরাসি, জর্ম্মান্, রুষ, ইটালিয়ান্, মার্কিন এবং তাহার নানা স্থানের নানা ঔপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র জটিল—তাহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয়, আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল্ ক্ষেত্রের সীমান্তরে পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাগ দ্বেষের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, সুতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকে, এইজন্যই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ পার্লামেন্টের এমন তন্দ্রাকর্ষক ;—ইংরেজ স্রোতের জলের মত নিয়তই এদেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এখানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার হৃদয় এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম্ম করিয়া যায়; যেটুকু আমোদ-আহ্লাদ করে, সেও স্বজাতির

সঙ্গে—এখানকার ইতিবৃত্তচর্চ্চার ভার জর্ম্মান্‌দের উপরে, এখানকার ভাষার সহিত পরিচয় সাক্ষীর জবানবন্দিসূত্রে, এখানকার সাহিত্যের সহিত পরিচয় গেজেটে গবর্মেণ্ট-অনুবাদকের তালিকাপাঠে—এমন অবস্থায় আমরা ইহাদের নিকট যে কত ছোট, তাহা নিজের প্রতি মমত্ববশত আমরা ভুলিয়া যাই, সেইজন্যই আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত হই, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি এবং আমাদের সেই ক্ষোভ-বিস্ময়কে অত্যুক্তি জ্ঞানে কর্ত্তৃপক্ষগণ কখনো বা ক্রুদ্ধ হন, কখনো বা হাস্যসংবরণ করিতে পারেন না।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অপবাদের স্বরূপ বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, ব্যাপারখানা এই—এবং ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, যে পদার্থ এত ক্ষুদ্র, তাহার মর্ম্মান্তিক বেদনাকেও তাহার সাঙ্ঘাতিক ক্ষতিকেও স্বতন্ত্র করিয়া, বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপরওয়ালার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে না। যাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর, তাহাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আমার ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া, আমার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভাগবিভাগ লইয়া, আমরা একটুখানি মিউনিসিপালিটি লইয়া, আমার এই সামান্য য়ুনিভার্সিটি লইয়া আমরা ভয়ে-ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি, আশ্চর্য্য হইতেছি, এত কলরবেও মনের মত ফল পাইতেছি না কেন? ভুলিয়া যাই ইংরেজ আমাদের উপরে আছে, আমাদের মধ্যে নাই। তাহারা যেখানে আছে, সেখানে যদি যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমরা কতই দূরে পড়িয়াছি, আমাদিগকে কতই ক্ষুদ্র দেখাইতেছে।

আমাদিগকে এত ছোট দেখাইতেছে বলিয়াই সেদিন কর্জ্জন্‌সাহেব অমন অত্যন্ত সহজকথার মত বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়াল্‌তন্ত্রের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না

কেন? সর্ব্বনাশ, আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার! এ যে একেবারে প্রণয়সম্ভাষণের মত শুনাইতেছে! এই, অষ্ট্রেলিয়া বল, ক্যানেডা বল, যাহাদিগকে ইংরেজ ইম্পীরিয়াল্ আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের শয়নগৃহের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া অপর্য্যাপ্ত প্রেমের সঙ্গীতে সে আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া নিজের রুটি পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য করিতে রাজি হইয়াছে—তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা! এত-বড় অত্যুক্তিতে যদি কর্ত্তার লজ্জা না হয়, আমরা যে লজ্জা বোধ করি! আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্ত্তৃত্ব-অধিকার হইতে কত দিকেই বঞ্চিত, এমনস্থলে ইম্পীরিয়াল্ বাসরঘরে আমা-দিগকে কোন্ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে! কর্জ্জন্‌সাহেব আমাদের সুখ দুঃখের সীমানা হইতে বহু ঊর্দ্ধে বসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না, নিজের এতটুকু স্বাতন্ত্র্য, এতটুকু ক্ষতিলাভ লইয়া এত ছট্‌ফট্ করে কেন? এ কেমনতর—যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেখানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য মাল্য-সিন্দুরহস্তে লোক আসে এবং এই সাদরব্যবহারে ছাগের একান্ত সঙ্কোচ দেখিয়া তাঁহাকে বলা হয়—একি আশ্চর্য্য, এতবড় মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! হায়, অন্যের যোগ দেওয়া এবং তাহার যোগ দেওয়াতে যে কত প্রভেদ, তাহা যে, সে একমুহূর্ত্তও ভুলিতে পারিতেছে না। যজ্ঞে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগশিশুর এই বেদনা যজ্ঞকর্ত্তার পক্ষে বোঝা কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিৎকর! ইম্পীরিয়াল্‌তন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো; সোমালি-ল্যাণ্ডে বিপ্লবনিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রানদান করা;

উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া! বড়য়-ছোটয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং অক্ষমের হিসাব যখন এক খাতায় রাখা হয়, তখন জমার অঙ্ক এবং খরচের অঙ্কের ভাগ এম্‌নিভাবে হওয়াই স্বাভাবিক—এবং যাহা স্বাভাবিক, তাহার উপর চোখ রাঙানো চলে না, চোখের জল ফেলাও বৃথা। স্বভাবকে স্বীকার করিয়াই কাজ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, আমরা যখন ইংরেজকে বলিতেছি, "তুমি সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠ, তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে খর্ব্ব কর", তখন ইংরেজ যদি জবাব দেয়, "আচ্ছা, তোমার মুখে ধর্ম্মোপদেশ আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ-মনুষ্য-স্বভাবের যে নিম্নতন্ কোঠায় আমি আছি, সেই কোঠায় তুমিও এস, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই—স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ কর—স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পার, অন্তত আরাম বল, অর্থ বল, কিছু একটা দাও! তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!" এ কথা বলিলে তাহার কি উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কি দিতেছি, কে কি করিতেছি। আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি—আলস্য-পূর্ব্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জ্জমা করি; ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই; ঘরের পাশে কি আছে জানিতে হইলেও হাণ্টার বই গতি নাই। তার পরে দেশের কৃষিসম্বন্ধে বল, বাণিজ্যসম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতাসত্ত্বেও আমাদের

দেশের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনসম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্ত্তব্য-নীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে, তাহার দায়িত্ব আছে, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই, এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনই যথার্থ আদান-প্রদান চলিতে পারে না। এক পক্ষে টাকা আছে, অন্যপক্ষে শুদ্ধমাত্র চেক্‌বই-খানি আছে, এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক্ ভাঙানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিস্বরূপে বরাবর চলে না—ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, একএকবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল—কিন্তু সে অপমান, সে ব্যর্থতা তারস্বরেই হৌক, আর নিঃশব্দেই হৌক, গলাধঃকরণ-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাট্‌সভাও করি খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড় কঠিন, তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্ব্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার জন্য বৈদ্য ডাকিতে হয় না।

আশা করি; আমাকে সকলে বলিলেন, তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ, নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ্ নিজেকে অর্জ্জন করিতে হইবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নূতনত্ব কোথায়! পুরাতন কথা বলিতেছি,—এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব, আমি নূতন-উদ্ভাবনা-বর্জ্জিত,—এ কলঙ্ক অঙ্গের ভূষণ করিব। কিন্তু যদি কেহ এমন কথা বলেন যে, এ আবার তুমি কি নূতন কথা তুলিয়া বসিলে, তবেই আমার পক্ষে মুস্কিল—কারণ, সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া

পাওয়া শক্ত। দুঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তখন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়। এমন কি, শুনিলে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, গালি দিতে থাকে। জনশূন্য পদ্মার চরে অন্ধকার-রাত্রে পথ হারাইয়া জলকে স্থল, উত্তরকে দক্ষিণ বলিয়া যাহার ভ্রম হইয়াছে, সেই জানে, যাহা অত্যন্ত সহজ, অন্ধকারে তাহা কিরূপ বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে, যেম্‌নি আলো হয়, অম্‌নি মুহূর্ত্তেই নিজের ভ্রমের জন্য বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমাদের এখন অন্ধকাররাত্রি—এখন এ দেশে যদি কেহ অত্যন্ত প্রামাণ্যকথাকেও বিপরীত জ্ঞান করিয়া কটূক্তি করেন, তবে তাহাও সকরুণ চিত্তে সহ্য করিতে হইবে, আমাদের কুগ্রহ ছাড়া কাহাকেও দোষ দিব না। আশা করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিখিতেই হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জ্ঞান করিয়া চলিলে একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিশ্চয় জানি, সকলেরই যে এই দশা, তাহা নহে। আমাদের এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন, যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কি দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহার কোন ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত, তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত—আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চ্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দ্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাইতেছি, সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া

তুলিবার জন্য; প্রার্থনা করিয়া যতই হতাশ হইতেছি, সে কেবল আমাদিগকে সেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্য; আমাদের দেশে দেশে পরমুখাপেক্ষী কর্ম্মহীন সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ যে নিরুপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সে কেবল এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্য;— কোনো বিশেষ আইন রদ্ করিবার জন্য নয়, কোনো বিশেষ গাত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্য নয়।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তখন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব, তাহাকে কার্য্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে। ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্য্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গম্ভীর, যাহা-কিছু মহৎ, তাহা সমস্ত উদ্বোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে; ইহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা ঐশ্বর্য্য লাভ করিব।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি, তবে আজ একটা বিঘ্ন, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্য যখন-তখন তাড়াতাড়ি দুইচারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টৌনহল মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না। এই যে থাকিয়া-থাকিয়া চম্‌কাইয়া ওঠা, পরে চীৎকার করা এবং তাহার পরে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে—আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ সম্বন্ধে গাম্ভীর্য্যরক্ষা করা আর ত সম্ভব হয় না। এই প্রহসন হইতে রক্ষা পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাজের ভার নিজে গ্রহণ করা।

এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেণ্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল—সেরূপ অভিমান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সঙ্গীতেই শোভা পায়। আমি আরো উল্‌টা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে—যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না, তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদানপ্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

আমরা অনেকে কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি যে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি, সরকার যদি তাহা সমস্ত পূরণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সন্তোষের অন্ত থাকে না। এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এক পক্ষে কেবলি চাওয়া, আর এক পক্ষে কেবলি দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়? ঘৃত দিয়া আগুনকে কোনোদিন নিবানো যায় না, সে ত শাস্ত্রেই বলে—এরূপ দাতাভিক্ষুকের সম্বন্ধ ধরিয়া যতই পাওয়া যায়, বদান্যতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেখানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না দাতার মহত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, সেখানে আমার পক্ষেও যেমন অমঙ্গল, দাতার পক্ষেও তেম্‌নি অসুবিধা।

কিন্তু যেখানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়েরই মঙ্গল—সেখানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ন্যায্য হইয়া আসে এবং সকল কথাই আপোসে মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। দেশে এরূপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন শক্তিকে দেশের মঙ্গল-

সাধনের উপায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের আকর। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে জড়পদার্থ করিয়া তুলিলে চলে না, নিজেকেও একস্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গবর্মেণ্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদূর পাইবার, তাহার শেষকড়া পর্য্যন্ত পাইতে পারি, যদি দেশকে আমাদের যতদূর পর্য্যন্ত দিবার, তাহার শেষকড়া পর্য্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে দুই পক্ষ আছে এবং দুই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া সকল কর্ম্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি যথার্থই কাজ করিতে চায়, তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত বাধা দেওয়া বড় শক্ত। এই মনে কর, স্বায়ত্ত শাসন। আমরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি যে, রিপন্ আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন, তাঁহার পরের কর্ত্তারা তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু ধিক্ এই কান্না! যাহা একজন দিতে পারে, তাহা আর একজন কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা কে না জানে! ইহাকে স্বায়ত্ত-শাসন নাম দিলেই কি ইহা স্বায়ত্তশাসন হইয়া উঠিবে?

অথচ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদেব ঘরের কাছে পড়িয়া আছে —কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে কবিতে পারি,—যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই; এজন্য গবর্মেণ্টের চাপ্‌রাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নাই।

কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে চুলায় যাক্ স্বায়ত্ত শাসন! তবে দড়ি ও কলসীর চেয়ে বন্ধু আমাদের আর কেহ নাই!

পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব—তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না, যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, সে উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।—তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ, কাড়িতেও ততক্ষণ—যে স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে অধিকার বিধাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহমুক্তচিত্তে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি—রিপনের জয় হউক্ এবং কর্জ্জনও বাঁচিয়া থাকুন্!

আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম্ম দিবে কে? কর্ম্মও আমাদিগকে দিতে হইবে। একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিতে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্ব্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জ্জীব দুর্ব্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে কর্ম্ম দিবে, সেই আমাদের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করিবে, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না,—যে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে, সে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের

স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না, ইহাও স্বাভাবিক। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্ত্তকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্ম্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে অবকাশ পরের দ্বারা কখনই সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন, কথাটা অত্যন্ত দুরূহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে—সহজ যদি হইত, তবে অশ্রদ্ধেয় হইত। কেহ যদি দরখাস্তকাগজের নৌকা বানাইয়া সাতসমুদ্রপারে সাতরাজার ধন মাণিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারো-কারো কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা কন্‌ষ্টিট্যুশনাল্ অ্যাজিটেশন্ নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সস্তায় বড় কাজ সারিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সস্তা উপায় বারংবার যখন ভাঙিয়া ছারকার হইয়া যায়, তখন পরের নামে দোষারোপ করিয়া স্বপ্তিবোধ করি—তাহাতে তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

নিজেদের বেলায় সমস্ত দায়কে হাল্কা করিয়া পরের বেলায় তাহাকে ভারি করিয়া তোলা কর্ত্তব্যনীতির বিধান নহে। আমাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ যখন বিচার করিব, তখন সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আলোচনা করিয়া আমাদের

প্রত্যাশার অঙ্ককে যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু আমাদের নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার সময় ঠিক তাহার উল্টাদিকে চলিতে হইবে। নিজের বেলা ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত সুবিধার খাতিরে নিজের আদর্শকে খর্ব্ব করার প্রতি আমরা আস্থা রাখিব না। সেইজন্য আমি আজ বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক-উত্তেজনা-মূলক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জবাব দিবার, জব্দ করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্ত্তব্য হইতে, সফলতা হইতে ভ্রষ্ট করে। লোকে যখন রাগ করিয়া মোকদ্দমা করিতে উদ্যত হয়, তখন নিজের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা যদি সেইরূপ মনস্তাপের উপর কেবলি উষ্ণবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি, তাহা হইলে ফললাভের লক্ষ্য দূরে গিয়া ক্রোধের পরিতৃপ্তিটাই বড় হইয়া উঠে। যথার্থভাবে, গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্তি দিতে হইবে। নিজেকে ক্রুদ্ধ এবং উত্যক্ত অবস্থায় রাখিলে সকল ব্যাপারের পরিণামবোধ চলিয়া যায়—ছোট কথাকে বড় করিয়া তুলি—প্রত্যেক তুচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া অসঙ্গত অমিতাচারের দ্বারা নিজের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে থাকি। এইরূপ চাঞ্চল্যদ্বারা দুর্ব্বলতার বৃদ্ধিই হয়—ইহাকে শক্তির চালনা বলা যায় না, ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই সকল ক্ষুদ্রতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—স্বভাবের দুর্ব্বলতার উপর নহে, পরের প্রতি বিদ্বেষের উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের প্রতিও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা

একই গাছের দুই ভিন্ন শাখা। ইহার দুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের দুর্ব্বলতা, তাহাকে বড় নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতেছি, তাহা নহে, গর্ব্ববোধ করিতেছি।

এ কথা একবার ভাবিয়া দেখ, মাতাকে তাহার সন্তানের সেব হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্য্যভার যদি অন্যে গ্রহণ করে, তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশহিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিতকর্ম্ম আগ্রহপূর্ব্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ, এরূপ চেষ্টা কোনোমতেই সফল হইবার নহে।

কিন্তু প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা যে আমাদের দেশে সুলভ নহে, এ কথা অন্তত আমাদের গোপন অন্তরাত্মার নিকট অগোচর নাই। যাহা নাই, তাহা আছে ভান করিয়া উপদেশ দেওয়া বা আয়োজন করায় ফল কি আছে? এ সম্বন্ধে উত্তর এই যে, দেশহিতৈষিতা আমাদের যথেষ্ট দুর্ব্বল হইলেও তাহা যে একেবারে নাই, তাহাও হইতে পারে না—কারণ, সেরূপ অবস্থা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমাদের এই দুর্ব্বল দেশহিতৈষিতাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টায় দেশের কাজ করিবার উপলক্ষ্য আমাদিগকে দেওয়া। সেবার দ্বারাতেই প্রেমের চর্চ্চা হইতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের শোষণ করিতে হইলে স্বদেশের সেবা করিবার একটা সুযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের

পক্ষে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে, যেখানে দেশ-জিনিষটা যে কি, তাহা ভূরিপরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না, যেখানে সেবাসূত্রে দেশের ছোট-বড়, দেশের পণ্ডিত-মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।

দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একস্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে একস্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি যে একটি স্বদেশীসংসদ্ গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি, তাহা যে একদিনেই হইবে—কথাটা পড়িবামাত্রই অম্‌নি যে দেশের চারিদিক্ হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না। স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকে খর্ব্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ সমস্ত কাজের লোকের গুণ—কাজ করিতে করিতে এই সকল গুণ বাড়িয়া উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উল্টা হয় এই সকল গুণের পরিচয় যে আমরা প্রথম হইতেই দেখাইতে পারিব, তাহাও আমি আশা করি না। কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা, যত ক্ষুদ্র আকারে হৌক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন সকল খাঁটি-লোক, শক্তলোক যাঁহারা আছেন, যাঁহারা দেশের কল্যাণকর্ম্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন এবং সেই কর্ম্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে একজন অধিনেতার চতুর্দ্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্ত্তী সংসদ্‌কে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্ত্তৃত্বে বরণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ্ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে। সুবিস্তীর্ণ আরম্ভের অপেক্ষা করা, সুবিপুল আয়োজন ও সমারোহের প্রত্যাশা করা কেবল

কর্ত্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া। এখনি আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্ম্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না। এমন কি, অবিলম্বে আমাদের শেষসম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না; আমি যাহা ব্যবহার না করিব, অন্যে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে; আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি, অন্যে আমার প্রভু হইয়া বসিবে; আমি যদি শক্তি অর্জ্জন না করি অন্যে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে; আমি যদি পরীক্ষায় কেবলি ফাঁকি দিই; তবে সফলতা অন্যের ভাগ্যেই জুটিবে—ইহা বিশ্বের অনিবার্য্য নিয়ম।

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এই যে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু যদি ইহাকে অপরাজিতচিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার, নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব, তবেই তুমি ধন্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবনসঞ্চার করা, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আহ্বান করা এই মহৎ সৃষ্টিকার্য্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে—এজন্য আনন্দিত হও! নিজের শক্তির প্রতি আস্থাস্থাপন কর, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধারক্ষা কর এবং ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কাল তাঁহারা বাংলার প্রাথমিকশিক্ষা চারখানা করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, নিশ্চয়ই ইহা দুঃখের বিষয়—কিন্তু শুধু কি নিরাশ্বাস দুঃখভোগেই এই দুঃখের পর্য্যবসান? ইহার পশ্চাতে কি কোনো কর্ম্ম নাই, আমাদের

কোনো শক্তি নাই? শুধুই অরণ্যে রোদন? ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে দুইটুক্‌রা করিতে গবর্মেণ্ট্ পারেন? আর, আমরা সমস্ত বাঙালি ইহাকে এক করিয়া রাখিতে পারি না? বাংলা-ভাষাকে গবর্মেণ্ট নিজের ইচ্ছামত চারখানা করিয়া তুলিতে পারেন? আর, আমরা সমস্ত বাঙালি তাহার ঐক্যসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না? এই যে আশঙ্কা, ইহা কি নিজেদের প্রতি নিদারুণ দোষারোপ নহে? যদি কিছুর প্রতিকার করিতে হয়, তবে কি এই দোষের প্রতিকারেই আমাদের একান্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে না? সেই আমাদের সমুদয় চেষ্টার সম্মিলন ক্ষেত্রে, আমাদের সমুদয় উদ্যোগের প্রেরণাস্থল, আমাদের সমুদয় পূজা-উৎসর্গের সাধারণ ভাণ্ডার যে আমাদের নিতান্তই চাই। আমাদের কয়েকজনের চেষ্টাতেই সেই বৃহৎ ঐক্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে। যাহা দুরূহ, তাহা অসাধ্য, এই বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ। এ পর্য্যন্ত আমরা ফুটা-কলসে জল ভরাকেই কাজ করা বলিয়া জানিয়াছি, সেই জন্যই বারবার আক্ষেপ করিয়াছি,—এ-দেশে কাজ করিয়া সিদ্ধিলাভ হয় না। বিজ্ঞানসভায় ইংরেজিভাষায় পুরাতন বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছি, অথচ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছি,—দেশের লোক আমার বিজ্ঞানসভার প্রতি এরূপ উদাসীন কেন? ইংরেজিভাষায় গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকে মিলিয়া রেজোল্যুশন্ পাস্ করিয়াছি, অথচ দুঃখ করিয়াছি, জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য-বোধের উদ্রেক হইতেছে না কেন? পরের নিকট প্রার্থনা করাকেই কর্ম্ম বলিয়া গৌরব করিয়াছি, তাহার পরে পরকে নিন্দা করিয়া বলিতেছি,—এত কাজ করি, তাহার পারিশ্রমিক পাই না কেন? একবার যথার্থ কর্ম্মের সহিত যথার্থ শক্তিকে নিযুক্ত করা যাক্, যথার্থ নিষ্ঠার সহিত যথার্থ উপায়কে অবলম্বন করা যাক্, তাহার পরেও

যদি সফলতালাভ করিতে না পারি তবু মাথা তুলিয়া বলিতে পারিব—

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

সঙ্কটকে স্বীকার করিয়া, দুঃসাধ্যতাসম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আসন্ন ফললাভের প্রত্যাশায় না ভুলাইয়া, এই দুর্ভাগ্য দেশের বিনা পুরস্কারের কর্ম্মে দুর্গমপথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি সেই বীরযুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি—রাজদ্বারের অভি-মুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয়শক্তি যে খনির মধ্যে নিহত আছে, সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু খনি আমাদের দেশের মর্ম্মস্থানেই আছে—যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি, তাহাদেরই নির্ব্বাক্ হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে। প্রবলের মন পাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সেই নিম্নতম গুহার গভীরতম ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনায় কে প্রবৃত্ত হইবে?

একটি বিখ্যাত সংস্কৃতশ্লোক আছে, তাহার ঈষৎপরিবর্ত্তিত অনুবাদ দ্বারা আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করি :—

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তাঁরি পরে জানি
কমলা সদয়।
পরে করিবেক দান এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয়।
পরকে বিস্মরি কর পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে!

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।

অদ্য বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্ এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে সম্ভাষণ করিবার ভার আমার উপরে পড়িয়াছে।

ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের কোন্‌খানে যোগ, সে কথা হয় ত তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার। যোগ আছে। সেই যোগ অনুভব করা ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলাই অদ্যকার এই সভার একটি উদ্দেশ্য।

তোমরা সকলেই জান, আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায়, তাহার স্থানে স্থানে তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া নক্ষত্র-আকার ধারণ করিতেছে এবং অপর অংশে জ্যোতির্বাষ্প অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—কিন্তু সংহত অসংহত সমস্তটা লইয়াই এই ছায়াপথ।

আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ম্ময় সারস্বত ছায়াপথ রচিত হইয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎকে তাহারই একটি কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে, ছাত্রমণ্ডলী তাহার চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্বাষ্পের মত বিকীর্ণ অবস্থায় আছে। এই ঘন অংশের সঙ্গে বিকীর্ণ অংশের যখন জাতিগত ঐক্য আছে, তখন সে ঐক্য সচেতনভাবে অনুভব করা চাই, তখন এই দুই আত্মীয় অংশের মধ্যে আদানপ্রদানের যোগস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে ঐক্যের কথা আজ আমি বলিতেছি, পঞ্চাশবছর পূর্ব্বে তাহা মুখে আনিবার জো ছিল না। তখন ইংরেজিশিক্ষামদে উন্মত্ত ছাত্রগণ মাতৃভাষার দৈন্যকে পরিহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং উপবাসী দেশীয়সাহিত্যকে একমুষ্টি অন্ন না দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালেও দেশের সাহিত্যসমাজ ও দেশের শিক্ষিত-সমাজের মাঝখানকার ব্যবধান রেখা অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তখনো ইংরেজিরচনা ও ইংরেজিবক্তৃতায় খ্যাতিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। এমন কি, যাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেন তাঁহারা ইংরেজিমাচার উপরে চড়িয়া তবে সেটুকু প্রশ্রয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তখনকার দিনে মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না, তখন কেহ বা বাংলার মিল্‌টন্‌, কেহ বা বাংলার বায়্‌রন্‌, কেহ বা বাংলার স্কট্‌ বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—এমন কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক্‌ বলিলে আমাদের আশ মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারো সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না;—কারণ, গ্যারিক্‌ যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মান্তর যাপন করিতেছিল।

কিন্তু প্রথম অবস্থার চেয়ে এই দ্বিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক। কারণ, বাংলায় বায়্‌রন্‌-স্কটের সুদূর সাদৃশ্য যে মিলিতে পারে, এ কথা ইংরেজি-ওয়ালার পক্ষে স্বীকার করা তখনকার দিনের একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

এখনকার তৃতীয় অবস্থায় ঐ ইংরেজি উপাধিগুলার কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বাংলাসাহিত্য আর কাহারো সহিত তুলনার আশ্রয় না লইয়া নিজমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সাহিত্যের প্রতি দেশের লোকের যথার্থ সম্মান ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।

ইহার কারণ, বাংলাসাহিত্য ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ অনুভব করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, আমাদের মনটা ইংরেজি গুরুমহাশয়ের অপরিমিত শাসন হইতে অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া

আসিতেছে। একদিন গেছে, যখন আমাদের শিক্ষিতলোকেরা ইংরেজিপুঁথির প্রত্যেক কথাই বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরেজিগ্রস্ততা এতদূর পর্য্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজি বিধিবিধানের সহিত কোনোপ্রকারে মিলাইতে না পারিয়া জামাইষষ্ঠী ফিরাইয়া দিয়াছে এবং আমোদ করিয়া বান্ধবের গায়ে আবির-লেপনকে চরিত্রের একটা চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলিয়া গণ্য করিয়াছে,—এত-বড় শিক্ষিত মূর্খতার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

এ রোগের সমস্ত উপসর্গ যে একেবারে কাটিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আজকাল আমরা ইংরেজি ছাপাখানার দ্বারে ধন্না না দিয়া নিজে সন্ধান করিতে, নিজে বাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন কি, পুঁথির প্রতিবাদ করিতেও সাহস হয়।

নিজের মধ্যে এই যে একটা স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি, যে অনুভূতি না থাকিলে শক্তির যথার্থ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, ইহা কোনো একটা দিকে আরম্ভ হইলে ক্রমে সকলদিকেই আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজে, সর্ব্বত্র আমরা ইহার পরিচয় পাইতেছি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং শাসন সমস্তই আমরা খৃষ্টান পাদ্রির চোখে দেখিতাম—পাদ্রির কষ্টিপাথরে কোন্‌টাতে কি রকম দাগ পড়িতেছে, ইহাই আলোচনা করিয়া দেশের সমস্ত জিনিষকে বিচার করিতে হইত।

প্রথম-প্রথম সে বিচারে দেশের কোনো জিনিষেরই মূল্য ছিল না। তার পরে মাঝে আর একটু ভাল লক্ষণ দেখা দিল। তখন আমরা বিলিতি গুরুকে বলিতে লাগিলাম, তোমাদের দেশে যা-কিছু গৌরবের বিষয় আছে, আমাদের দেশেও তা সমস্তই ছিল;—আমাদের দেশে রেলগাড়ি এবং বেলুন ছিল, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে এবং ঋষিরা জানিতেন সূর্য্যালোকে গাছপালা অক্সিজেন্‌ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে,

সেইজন্যই প্রাতঃকালে পূজার পুষ্পচয়নের বিধান হইয়াছে। এ কথা বলিবার সাহস ছিল না যে, রেলগাড়ি-বেলুন না থাকিলেও গৌরবের কারণ থাকিতে পারে এবং ফাঁকি দিয়া অক্সিজেন্‌বাষ্প গ্রহণ করানোর চেয়ে নির্ম্মল প্রত্যুষে সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে সুন্দরভাবে দেবতার সেবায় লোকের মনকে নিযুক্ত করিবার মাহাত্ম্য অধিক।

এখনো এ ভাবটা আমরা যে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তা নয়। এ কথা এখনো সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই যে, পাদ্‌রির কষ্টি-পাথরে যাহা উজ্জ্বল দাগ দেয়, তাহা মূল্যবান্ হইতে পারে, কিন্তু জগতে সোনাই ত একমাত্র মূল্যবান্ পদার্থ নয়;—পাথরে কিছুমাত্র দাগ টানে না, এমন মূল্যবান্ জিনিষও জগতে আছে। যাহা হউক, বন্ধন শিথিল হইতেছে। আজ কাল অল্প অল্প করিয়া এ কথা বলিতে আমরা সাহস করিতেছি যে, পাদ্রির বিচারে যাহা নিন্দনীয়, বিলাতের বিধানে যাহা গর্হিত, আমাদের দিক্ হইতে তাহার পক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে।

আমরা যাহাকে পলিটিক্স্ বলি, তাহার মধ্যেও এই ভাবটা দেখিতে পাই। প্রথমে যাহা সানুনয় প্রসাদভিক্ষা ছিল, দ্বিতীয় অবস্থাতে তাহার ঝুলি খসে নাই, কিন্তু তাহার বুলি অন্যরকম হইয়া গেছে—ভিক্ষুকতা যতদূর পর্য্যন্ত উদ্ধত স্পর্দ্ধার আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা করিয়াছে। আমাদের আধুনিক আন্দোলনগুলিকে আমরা বিলাতী রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।

তৃতীয় অবস্থায় আমরা ইহার উপরের ধাপে উঠিবার চেষ্টা করিতেছি। এ কথা বলিতে সুরু করিয়াছি যে, হাতজোড় করিয়াই ভিক্ষা করি, আর চোখ রাঙাইয়াই ভিক্ষা করি, এত সহজ উপায়ে গৌরবলাভ করা যায় না—দেশের জন্য স্বাধীনশক্তিতে যতটুকু কাজ নিজে

করিতে পারি, তাহাতে দুইদিকে লাভ—এক ত ফললাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, সেটা ফললাভের চেয়ে বেশি বই কম নয়—সেই গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমাদের দেশের গুরু বলিয়াছেন, ফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া কর্ম্ম করিবে। ভিক্ষার অগৌরব এই যে, ফললাভ হইলেও নিজের শক্তি নিজে খাটাইবার যে সার্থকতা, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

যাহা হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক্ দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীনশক্তির গৌরব অনুভব করিবার একটা উদ্যম অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি—সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিক্স পর্য্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।

ইহার একটা ফল এই দেখিতেছি, পূর্ব্বে ইংরেজিশিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন-নবীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল, এখন তাহার উল্টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা-বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজিবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে। একদিন যেখানে বিপক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, সেখান হইতেও বঙ্গের বিজয়িনী বাণী স্বেচ্ছাসমাগত সেবকদের অর্ঘলাভ করিতেছেন।

পূর্ব্বে এমন দিন ছিল, যখন এই ইংরেজীপাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ী আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি-

কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজিবক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক্, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া ত শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট্‌খেলাতেও না হয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না? যদি পড়ে, তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব, ওটা মাটির প্রদীপ? ঐ মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় ত সে দোষ কার্? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেম্‌নি হোক্ না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক্, যখন আনন্দের দিন আসিবে, তখন ঐখানেই আমাদের উৎসব; আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ঐ গৃহে ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরৎ আসিয়াছি। আজ সাহিত্যপরিষদ্ আমাদিগকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা কলেজক্লাস্ হইতে দূরে, তাহা ক্রিকেট্‌ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধ্যাবেলাকার মাটির প্রদীপটিই জ্বলিতেছে। সেখানে আয়োজন খুব বেশি নাই—কিন্তু তোমরা এক সময়ে তাঁহার কাছে শ্রান্ত দেহে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সমস্তদিন যিনি পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন, আয়োজনে কি তাঁহার গৌরব প্রমাণ হইবে? তিনি এইমাত্র জানেন যে, তোমরাই তাঁহার একমাত্র গৌরব এবং আমরা জানি, তোমাদের একমাত্র গৌরব তাঁহার চরণের ধূলি, ভিক্ষালব্ধ রাজপ্রসাদ নহে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য

ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে—সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে, তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগস্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। যেরূপ দেখা যাইতেছে, বিদ্যাশিক্ষা কালক্রমে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়া এই প্রভেদকে বাড়াইয়া তুলিবে।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কি করিলে বিদেশীচালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্য্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা, নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়-গুলিকেই পাওয়া যায়, তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎকে অনুরোধ করিতেছি—আমার অনুনয়, বাঙালী ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীনশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন—যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎপরিমাণেও নিজের শক্তি-প্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্ত্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজিবিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিষ আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত

নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চ্চা যদি প্রধানতঃ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্ব্বল হইবেই। যাহা পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে, যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে; তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয়, তবে ইহার প্রধান কারণ এই; বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জন-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে-বাহিরে নানাস্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কি জিনিষ, তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে-নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্ম্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্ব্বক, অভিনিবেশপূর্ব্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্ম্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিবে, এমন, দূরদেশের ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় বই পড়িয়ামাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্ব্বল থাকে, তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না। এমন কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি; ধর্ম্ম, সমাজ, এমন কি, সাহিত্য সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিবর্জ্জিত হইলে আমাদের মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ নানাপ্রকার অসঙ্গত অনুকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এতকাল গেল, তথাপি এই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত-অনুকরণ-মূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে, আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না,—আমাদের দেশ যে কিরূপ, তাহা সন্ধানপূর্ব্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা-তোরাজিরো জাপানের একজন বিখ্যাত প্যাট্রিয়ট্ ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চালচিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়া

বেড়াইয়াছেন। এইরূপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন—শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ প্যাট্রিয়টিজ্‌মের অর্থ বুঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মত ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্ আপনার আলোচ্যবিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন্। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিক্‌কে, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানার চর্চ্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চ্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যপরিষদ্ সার্থকতালাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহার দুইএকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি

প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃতলোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত-লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্ত্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—যেখানেই হোক্ না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্বস্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnologyর বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত্ত, পোদ্-বাগ্দি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথিসম্বন্ধে আমাদের কত-বড় একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত-বড় মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্বত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্ব্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া, গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্যবিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষদ্ নিজের কর্ত্তব্যনিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্ম্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য আমার অনুরোধ পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত সুদূরকালের কথা বোঝায়, এত-বড় প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না—কিন্তু আমাদের

তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্ত্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্ত্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্ত্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সেকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে খোঁটা দিতে বসেন—তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চস্‌মাচোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অদ্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি, তাহা যথার্থ কি না, তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভাল কি মন্দ, তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে—কিন্তু ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ এই ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কি চোখে যে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন-সকল সঙ্কল্পে বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্যসংবরণ করিতে পারিবে না—এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সব কথা যদি খুলিয়া বলি, তবে তোমরা এই মনে করিয়া

বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সেকালে আমরা,—বালকেরা,—সকলেই যে একবয়সী ছিলাম, তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্ককেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীনে-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জা-নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সেদিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল, তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি?

অপরিচিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্পবয়সের প্রথম সম্বল; কর্ম্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেম্‌নি আশা-উৎসাহ-মাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ঐ আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাতপা ছুঁড়িতে থাকে,—তাহাদের সেই শরীরসঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে—কিন্তু সেই অকারণ হাত-পা-ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে, তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্প বয়সে উদ্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে, উদ্দামভাবে চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছিল—তখনকার পক্ষে তাহা অদ্ভুত ছিল না, তাহা বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল, এবং আমরা কেবল পড়িয়া-পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না—এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল, অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথমবয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন, তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই—লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্য্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়্‌রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবাল্‌ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্রিয়টিজ্‌মের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ, তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীর রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম—এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধূলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

"আইডিয়া" যত বড়ই হোক্, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক্, দীন হউক্, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে, হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণস্বরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লিতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্যভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে করযোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিথাইয়া কেরাণিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্দ্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে ত অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হোক্, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মত বাহির হইলাম, ভিথারীর মত পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের থাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ,—নিজের জঠরগহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দ্দিষ্ট—এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিটথাম্বাজরাগিণীতে যতই মর্ম্মভেদী হউক না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝঙ্কারমধুর বেতনটি মিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এম্‌নি করিয়া যে মানুষ একদিন

উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে, সে যখন সেই ভাব-পুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরী স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিনশেষ করে—একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণসমস্তই হঠাৎ দিয়া-ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয়, সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্যনির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্প-কল্পনার বিলাসভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিন হৃদয় হইয়া উঠে যে, উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূরপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া শিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়ই হোক্, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ-বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহঙ্কার তৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া অসাল সজড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্ত্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড় জিনিষ কল্পনা করিলেও হইবে না, বড় দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না এবং ছোট মুখে বড় কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোট কাজ সুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চ্চা হইবে—সেই শক্তির চর্চ্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ যে কি, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও ত ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মত পক্ককেশের নীচে

এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে, তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ণ, সেই প্রভাতসূর্য্যরশ্মি নির্ম্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই—উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্ব্বিচারে আত্মবিসর্জ্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র-বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—নিজের ব্যবসায়ের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে; আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমরমহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে, তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মত বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্ম্মের পথে। কর্ম্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে—কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে—গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে

প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতে হয় ;—এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নতব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন, সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ ত সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই ;—দেশ যথন বিলাতি পিনাক বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল, তথন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই—প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্ব্বেই বসাইয়াছেন, সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ—আর আজ সাহিত্যপরিষদ্ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন, তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে—সে আহ্বান দেশের "উৎসবে ব্যসনে চৈব," কিন্তু "রাজদ্বারে শ্মশানে চ" নয় বলিয়াই কি তোমাদের উৎসাহ হইবে না ?—সাহিত্যপরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি—দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্ব্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে পরিষদ্ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহনখ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না—সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিষমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারের খ্যাতিবিহীন কর্ম্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক কর। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে,

যদি শক্তি থাকে তবে কর্ম্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষ্যের অভাব নাই, সেজন্য গবর্মেণ্টের কোনো আইনপাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধ-দ্বারের কাছে অনন্যকর্ম্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্যক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অদ্যকার বক্তব্যবিষয়সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা ত শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশীভাষার ব্যাকরণ চর্চ্চা কর, অভিধান সঙ্কলন কর, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ কর। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসঙ্গত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি—কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অসঙ্গত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। যদি কোনো মাতার এমন অবস্থা হয় যে, ছেলের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য দেশবিদেশের বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া তিনি কুলকিনারা পাইতেছেন না, তবে তাঁহাকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যত্ন করিয়া বুঝাইতে হয়—আগে দেখ তোমার ছেলেটা কোথায় আছে, কি করিতেছে, সে পাতকুয়ায় পড়িল, কি আল্‌পিন্ গিলিয়া বসিল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, কি শীত করিতেছে? এ সব কথা সাধারণত বলিতেই হয় না, কিন্তু যদি দুর্দ্দৈবক্রমে বিশেষস্থলে বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে বাহুল্য করিয়াই বলিতে হয়। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্য বক্তৃতা কর, সভা কর, তর্ক কর, তবে তাহা সকলে অতি-সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয়, দেশকে জান ও তাহার পরে স্বহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা কর, তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্ত্তব্যসম্বন্ধে

দুটো-একটা সামান্য কথা বলিতে যদি অসামান্য বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জ্জনা করিতে হইবে। বস্তুত সকালবেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে, তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না—সূর্য্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না—অবিচলিত আশার সহিত, আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্ঝটিকার মাঝে মাঝে ঐ যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে—সূর্য্যরশ্মির ছটা খরধার কৃপাণের মত আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিনচারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে—আর ভয় নাই—আমাদের রাজপথ গৃহদ্বারের সম্মুখেই অনতিবিলম্বে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—তখন দিগ্বিদিক্ সম্বন্ধে দশজন মিলিয়া দশপ্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদবিতণ্ডা করিতে হইবে না—তখন সকলে আপন-আপন শক্তি অনুসারে আপন-আপন পথ নির্ব্বাচন করিয়া তর্ক সভা হইতে, পুঁথির রুদ্ধকক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব—তখন নিকটের কাজকে দূর করিয়া মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—সেইজন্য, পরিষদের অদ্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলাদেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে কর—তবু আমি ক্ষুব্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, জননি, সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙ্গিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানদের পদধ্বনি ঐ শুনা যাইতেছে,—এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ—তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের

ছোটো-বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্গদ আশীর্ব্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।

য়ুনিভার্সিটি বিল্।

এতকাল ধরিয়া য়ুনিভার্সিটি বিলের বিধিবিধান লইয়া তন্নতন্ন করিয়া অনেক আলোচনা হইয়া গেছে, সেগুলির পুনরুক্তি বিরক্তিকর হইবে। মোটামুটি দুইএকটা কথা বলিতে চাই।

টাকা থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে, সমস্ত অবস্থা অনুকূল হইলে বন্দোবস্তর চূড়ান্ত করা যাইতে পারে, সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু অবস্থার প্রতি তাকাইয়া দুরাশাকে থর্ব্ব করিতেই হয়। লর্ড কার্জ্জন্ ঠিক বলিয়াছেন, বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ খুব ভাল—কিন্তু ভারতবন্ধু লাট্‌সাহেব ত বিলাতের সব ভাল আমাদিগকে দিবার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই, মাঝে হইতে কেবল একটা ভালই মানাইবে কেন?

প্রত্যেকের সাধ্যমত যে ভালো, সে-ই তাহার সর্ব্বোত্তম ভালো,—তাহার চেয়ে ভালো আর হইতে পারে না—অন্যের ভালোর প্রতি লোভ করা বৃথা।

বিলাতী য়ুনিভার্সিটিগুলাও একেবারেই আকাশ হইতে পড়িয়া অথবা কোনো জবর্দস্ত শাসনকর্ত্তার আইনের জোরে একরাত্রে পূর্ণ-পরিণত হইয়া উঠে নাই। তাহার একটা ইতিহাস আছে। দেশের অবস্থা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বভাবত বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহার প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে, আমাদের য়ুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল—স্বাভাবিক নিয়মের কথা ইহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না।

সে কথা ঠিক। ভারতবর্ষের য়ুনিভার্সিটি দেশের প্রকৃতির সঙ্গে যে মিশিয়া গেছে, আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাঙ্গ হইয়া গেছে, তাহা বলিতে পারি না—এখনো ইহা আমাদের বাহিরে রহিয়াছে।

কিন্তু ইহাঁকে আমরা ক্রমশ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি—আমাদের স্বদেশীদের পরিচালিত কলেজগুলিই তাহার প্রমাণ।

ইংরাজের কাছ হইতে আমরা কি পাইয়াছি, তাহা দেখিতে হইলে কেবল দেশে কি আছে তাহা দেখিলে চলিবে না, দেশের লোকের হাতে কি আছে, তাহাই দেখিতে হইবে।

রেলোয়ে, টেলিগ্রাফ্‌ অনেক দেখিতেছি, কিন্তু তাহা আমাদের নহে—বাণিজ্য-ব্যবসায়ও কম নহে, কিন্তু তাহারো যৎসামান্য আমাদের! রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও বিস্তৃত, কিন্তু তাহার যথার্থ কর্তৃত্বভার আমাদের নাই বলিলেই হয়, তাহার মজুরের কার্য্যই আমরা করিতেছি, তাহাও উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যে জিনিষ যথার্থ আমাদের, তাহা কম ভাল হইলেও, তাহার ত্রুটি থাকিলেও, তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও তাহাকেই আমরা লাভ বলিয়া গণ্য করিব।

যে বিদ্যা পুঁথিগত,—যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড, তেম্‌নি যে শিক্ষাদানপ্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত, তাহাও আমাদের পক্ষে প্রায় তেম্‌নি নিষ্ফল। দেশের বিদ্যাশিক্ষাদান দেশের লোকের হাতে আসিতেছিল, বস্তুত ইহাই বিদ্যাশিক্ষার ফল। সেও যদি সম্পূর্ণ গবর্মেণ্টের হাতে গিয়া পড়ে, তবে খুব ভাল য়ুনিভার্সিটিও আমাদের পক্ষে দারিদ্র্যের লক্ষণ।

আমাদের দেশে বিদ্যাকে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য করা কোনোমতেই সঙ্গত নহে। আমাদের সমাজ শিক্ষাকে সুলভ করিয়া রাখিয়াছিল—দেশের উচ্চনীচ সকল স্তরেই শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে প্রবাহিত

হইতেছিল। সেই সমস্ত স্বাভাবিক প্রণালী ইংরাজিশিক্ষার ফলেই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল—এমন কি, দেশে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠ, কথকতা-যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিতেছে। এমন সময়ে ইংরাজিশিক্ষাকেও যদি দুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তবে গাছে তুলিয়া-দিয়া মই কাড়িয়া লওয়া হয়।

বিলাতী সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অনেক টাকার ধন। আমোদ হইতে লড়াই পর্য্যন্ত সমস্তই টাকার ব্যাপার। ইহাতে টাকা একটা প্রকাণ্ড শক্তি হইয়া উঠিয়াছে এবং টাকার পূজা আজ-সমস্ত পূজাকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে।

এই দুঃসাধ্যতা, দুর্লভতা, জটিলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান দুর্ব্বলতা। সাঁতার দিতে গিয়া অত্যন্ত বেশি হাত-পা-ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয়, কোনো সভ্যতার মধ্যে যখন সর্ব্ববিষয়েই প্রয়াসের একান্ত আতিশয্য দেখা যায়, তখন ইহা বুঝিতে হইবে, তাহার যতটা শক্তি বাহিরে দেখা যাইতেছে, তাহার অনেকটারই প্রতিমুহূর্ত্তে অপব্যয় হইতেছে। বিপুল মালমস্‌লা-কাঠখড়ের হিসাব যদি ঠিকমত রাখা যায়, তবে দেখা যাইবে, মজুরি পোষাইতেছে না। প্রকৃতির খাতায় সুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে, মাঝে মাঝে তাগিদের পেয়াদাও যে আসিতেছে না, তাহাও নহে—কিন্তু সে লইয়া আমাদের চিন্তা করিবার দরকার নাই।

আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনি-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্র্য কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা মনুষ্যত্বেরও অভাব—কারণ, সেখানে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপকরণই চড়াদরে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে দরিদ্রের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল, কারণ আমাদের সমাজে সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-

আমোদ মোটের উপরে সকলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বসিয়াছে, গরীবের ছেলেরা বিনা বেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়াছে—রাজার সভায় যে উৎসব হইয়াছে, দরিদ্র প্রজা বিনা আহ্বানে তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ধনীর বাগানে দরিদ্র প্রত্যহ পূজার ফুল তুলিয়াছে,—কেহ তাহাকে পুলিসে দেয় নাই, সম্পন্নব্যক্তি দীঘি-ঝিল কাটাইয়া তাহার চারদিকে পাহারা বসাইয়া রাখে নাই। ইহাতে দরিদ্রের আত্মসম্ভ্রম ছিল—ধনীর ঐশ্বর্য্যে তাহার স্বাভাবিক দাবী ছিল, এইজন্য, তাহার অবস্থা যেমনই হৌক, সে পাশবর্ত্তী প্রাপ্ত হয় নাই—যাঁহারা জাতিভেদ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মুখস্থ বুলি আওড়ান্, তাঁহারা এ সব কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না।

বিলাতী লাট্ আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার কি? আমাদের কানে এ কথাটা অত্যন্ত বিদেশী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।

কিন্তু সমস্ত সহিতে হইবে। তাই বলিয়া বসিয়া-বসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না।

আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি, তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সমাজের ব্যবস্থা ছিল—রাজার উপরে, বাহিরে সাহায্যের উপরে ইহার নির্ভর ছিল না—সমাজ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে।

এখন বিদ্যাশিক্ষা রাজার কাজ পাইবার সহায়স্বরূপ হইয়াছে, তখন বিদ্যাশিক্ষা সমাজের হিতসাধনের উপযোগী ছিল। এখন সমাজের সহিত বিদ্যার পরস্পর সহায়তার যোগ নাই। ইহাতে এতকাল পরে শিক্ষাসাধনব্যাপার ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদঅপেক্ষী হইয়াছে।

এ অবস্থায় রাজা যদি মনে করেন, তাঁহাদের রাজপলিসির অনুকূল

করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, রাজভক্তির ছাঁচে ঢালিয়া ইতিহাস রচিতে হইবে, বিজ্ঞানশিক্ষাটাকে পাকেপ্রকারে খর্ব্ব করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সর্ব্বপ্রকার আত্মগৌরববোধকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না—কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম—আমরা সে কর্ম্মের ফলভোগ করিব, কিন্তু সে কর্ম্মের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার আশা করিব কিসের জোরে?

তা ছাড়া, বিদ্যাজিনিষটা কলকারখানার সামগ্রী নহে। তাহা মনের ভিতর হইতে না দিলে দিবার জো নাই। লাট্‌সাহেব তাঁহার অক্‌স্‌ফোর্ড্‌—কেম্ব্রিজের আদর্শ লইয়া কেবলি আস্ফালন করিয়াছেন; এ কথা ভুলিয়াছেন যে, সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে ব্যবধান নাই—সুতরাং সেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান স্বাভাবিক। শিক্ষক সেখানে বিদ্যাদানের জন্য উন্মুখ এবং ছাত্রেরাও বিদ্যালাভের জন্য প্রস্তুত—পরস্পরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূরত্ব নাই, অশ্রদ্ধার কণ্টক-প্রাচীর নাই, কাজেই সেখানে মনের জিনিষ মনে গিয়া পৌঁছায়। পেড্‌লারের মত লোক আমাদের দেশের অধ্যাপক,—শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ, তিনি আমাদিগকে কি দিতে পারেন, আমরাই বা তাঁহার কাছ হইতে কি লইতে পারি! হৃদয়ে হৃদয়ে যেখানে স্পর্শ নাই, যেখানে সুস্পষ্ট বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে; সেখানে দৈব-বিড়ম্বনায় যদি দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবে সে সম্বন্ধ হইতে শুধু নিষ্ফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেম্ব্রিজ-অক্‌স্‌ফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে, কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী

শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মত করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেষণ করিবেন, ধনমদগর্ব্বিতা বণিক্‌গৃহিণীর মত উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।

পরের কাছে হইতে হৃদ্যতাবিহীন দান লইবার একটা মস্ত লাঞ্ছনা এই যে, গর্ব্বিত দাতা খুব বড় করিয়া খরচের হিসাব রাখে, তাহার পরে দুইবেলা খোঁটা দেয়—'এত দিলাম তত দিলাম, কিন্তু ফলে কি হইল ?' মা স্তন্যদান করেন, খাতায় তাহার কোনো হিসাব রাখেন না, ছেলেও বেশ পুষ্ট হয়—স্নেহবিহীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া রোরুদ্যমান মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দেয়, তাহার পরে অহরহ খিট্‌খিট করিতে থাকে—'এত গেলাইতেছি, কিন্তু ছেলেটা দিন দিন কেবল কাঠি হইয়া যাইতেছে !'

আমাদের ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই বুলি ধরিয়াছেন। পেড্‌লার সেদিন বলিয়াছেন, আমরা বিজ্ঞানচর্চ্চার এত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, এত আনুকূল্য করিলাম, বৃত্তির টাকায় এত অপব্যয় করিতেছি, কিন্তু ছাত্রেরা স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না !

অনুগ্রহজীবীদিগকে এই সব কথাই শুনিতে হয়—অথচ আমাদের বলিবার মুখ নাই। বন্দোবস্ত সমস্ত তোমাদেরই হাতে, এবং সে বন্দোবস্ত যদি যথেষ্ট ফললাভ না হয়, তাহার সমস্ত পাপ আমাদেরই। এদিকে খাতায় টাকার অঙ্কটাও গ্রেট্‌প্রাইমার অক্ষরে দেখান হইতেছে—যেন এত বিপুল টাকা এত-বড় প্রকাণ্ড অযোগ্যদের জন্য জগতে আর কোনো দাতাকর্ণ ব্যয় করে না—অতএব ইহার "moral" এই—হে অক্ষম, হে অকর্ম্মণ্য, তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তোমরা রাজভক্ত হও, তোমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চাঁদা দিতে কপোলযুগ পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না !

ইহাতে বিদ্যালাভ কতটুকু হয় জানি না, কিন্তু আত্মসম্মান থাকে

না। আত্মসম্মান ব্যতীত কোন জাত কোনো সফলতা লাভ করিতে পারে না—পরের ঘরে জল-তোলা এবং কাঠ-কাটার কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু দ্বিজধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে যে খোঁটা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। এবং যাঁহারা খোঁটা দেন, তাঁহারাও যে মনে মনে তাহা জানেন না, তাহাও আমরা স্বীকার করিব না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, পাছে তাঁহাদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা ত্রস্ত আছেন।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, বিলাতী সভ্যতা বস্তুত দুরূহ ও দুর্লভ নয়। স্বাধীন জাপান আজ পঞ্চাশবৎসরে এই সভ্যতা আদায় করিয়া লইয়া গুরুমারা বিদ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ সভ্যতা অনেকটা ইস্কুলের জিনিষ, পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চ্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর। জাপানের মত সম্পূর্ণ সুযোগ ও আনুকূল্য পাইলে এই ইস্কুলপাঠ আমরা পেড্‌লাব-সম্প্রদায় আসিবার বহুকাল পূর্ব্বেই শেষ করিতে পারিতাম। প্রাচ্য সভ্যতা ধর্ম্মগত—তাহার পথ নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—তাহা ইস্কুলের পড়া নহে, তাহা জীবনের সাধনা।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কালেজের পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীনবুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন। পরের সহিত তর্কের জন্যই এগুলি স্মরণীয়, তাহা নহে, নিজেদের উৎসাহ ও আত্ম-সম্ভ্রমের জন্য। পরের কথায় নিজেদের প্রতি যেন অবিশ্বাস না জন্মে!

যাহাতে আমাদের যথার্থ আত্মসম্মানবোধের উদ্রেক হয়, বিদেশীরা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিবে না এবং সেজন্য আমরা যেন ক্ষোভ অনুভব না করি। যেখানে যাহা স্বভাবতই আশা করা যাইতে পারে না, সেখানে তাহা আশা করিতে যাওয়া মূঢ়তা—এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া পুনঃপুন সেইখানেই ধাবিত হইতে যাওয়া যে কি, ভাষায় তাহার কোনো শব্দ নাই। এস্থলে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মত যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া; অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিষ করিয়া দাঁড় করানো; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা; বাহিরে আপাতত তাহার দীনবেশ, তাহার কৃশতা দেখিয়া ধৈর্য্যভ্রষ্ট না হইয়া আশার সহিত, আনন্দের সহিত হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়া, জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে সতেজ ও সফল করা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য, একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহাকে যদি দুরাশা বল, তবে কি পরের রুদ্ধদ্বারে জোড়হস্তে বসিয়া থাকাই আশা পূর্ণ হইবার একমাত্র সহজ প্রণালী? কবে কন্সার্ভেটিব্ গবর্মেণ্ট্ গিয়া লিবারেল্ গবর্মেণ্টের অভ্যুদয় হইবে, ইহারই অপেক্ষা করিয়া শুষ্কচঞ্চু বিস্তারপূর্ব্বক নিদাঘমধ্যাহ্নের আকাশে তাকাইয়া থাকাই কি হতবুদ্ধি হতভাগ্যের একমাত্র সদুপায়?

অবস্থা ও ব্যবস্থা।*

আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, সুতরাং উত্তেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা আমি মনে করি না। বসন্তকালের ঝড়ে যখন রাশিরাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে, তখন সে বোলগুলি কেবলি মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেম্‌নি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজস্র বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।

তবু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যখন বোল ঝরিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, ফল ফলিবার সময় সুদূরে নাই। আমাদের দেশেও কিছুদিন হইতে বলা হইতেছিল যে, নিজের দেশের অভাবমোচন দেশের লোকের নিজের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর, দেশের লোকই দেশের চরম অবলম্বন, বিদেশী কদাচ নহে,—ইত্যাদি; নানা মুখ হইতে এই যে বোলগুলি ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা উপস্থিতমত মাটি হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমিকে নিশ্চয়ই উর্ব্বরা করিতেছিল এবং একটা সফলতার সময় যে আসিতেছে, তাহারও সূচনা করিয়াছিল।

অবশেষে আজ বিধাতা তীব্র উত্তাপে একটি উপদেশ স্বয়ং পাকাইয়া তুলিয়াছেন। দেশ গতকল্য যে সকল কথা কর্ণপাত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে নাই, আজ তাহা অতি অনায়াসেই চিরন্তন সত্যের ন্যায় গ্রহণ করিতেছে। নিজেরা যে এক হইতে হইবে

* ১৩১১ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোনো কোনো অংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনরুক্ত হইয়াছে।

পরের দ্বারস্থ হইবার জন্য নহে, নিজেদের কাজ করিবার জন্য, এ কথা আজ আমরা একদিনেই অতি সহজেই যেন অনুভব করিতেছি, বিধাতার বাণীকে অগ্রাহ্য করিবার জো নাই।

অতএব আমার মুখে আজ উত্তেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে—ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন, তাঁহার অগ্নিময় তর্জ্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁয়ার পরে ভিজা-কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্ব্বে রান্না চড়াইতে হইবে; শুধু শুধু শূন্য চুলায় আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও নিকটে অগ্রসর হয় এবং অন্নের আশা সুদূরবর্ত্তী হইতে থাকে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সমস্ত দেশের লোকের ভাবনাকে একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তখন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হইয়া কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমরা স্বদেশের হিতসাধনসম্বন্ধে নিজের কাছে যে সকল আশা করি না, পরের কাছ হইতে সেই সকল আশা করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই মঙ্গলকর। নিরাশ হইবার মত আঘাত বারবার পাইয়াছি, কিন্তু চেতনা হয় নাই। এবারে ঈশ্বরের প্রসাদে আর একটা আঘাত পাইয়াছি, চেতনা হইয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

"আমাদিগকে তোমরা সম্মান দাও, তোমরা শক্তি দাও, তোমরা নিজের সমান অধিকার দাও"—এই যে সকল দাবী আমরা বিদেশী

রাজার কাছে নিঃসঙ্কোচে উপস্থিত করিয়াছি, ইহার মূলে একটা বিশ্বাস আমাদের মনে ছিল। আমরা কেতাব পড়িয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে, মানুষমাত্রেরই অধিকার সমান, এই সাম্যনীতি আমাদের রাজার জাতির।

কিন্তু সাম্যনীতি সেইখানেই খাটে, যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে, তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। য়ুরোপীয়ের প্রতি য়ুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই, তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতামাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি অবলম্বন করে, তবে সেই প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে কোনোমতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে? সে প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর? অতএব সাম্যের দরবার করিবার পূর্ব্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথা করা কাপুরুষতা।

ইহা আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, যে সকল জাতি ইংরেজের সঙ্গে বর্ণে, ধর্ম্মে, প্রথায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাদিগকে ইঁহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন, এমন ইহাদের ইতিহাসে কোথাও নাই। এমন কি, তাহারা ইঁহাদের সংঘর্ষে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে, এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ভারতবর্ষের রাজাদের যখন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, তখন তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমণ্ডলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের কিরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়াছিলেন —তাহার প্রমাণ এই পার্শিজাতি। ইহারা গোহত্যা প্রভৃতি দুইএকটি বিষয়ের হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম্ম, সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য কোনো অংশে বিসর্জ্জন না দিয়া হিন্দুদের অতিথিরূপে প্রতিবেশিরূপে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে, রাজা বা জনসমাজের হস্তে পরাজিত-বলিয়া উৎপীড়ন সহ্য করে নাই।

ইহার সহিত ইংরেজ-উপনিবেশগুলির ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের সাম্যবাদের প্রভেদটা আলোচনা করিবার সুযোগ হইবে।

সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতী উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল, তাহার বিবরণ হয় ত অনেকে ষ্টেট্স্‌ম্যান্‌পত্রে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একবাক্যে সকলে স্থির করিয়াছেন যে, এসিয়ার লোকদিগকে তাঁহারা কোনোপ্রকারেই আশ্রয় দিবেন না। ব্যবসায় অথবা বাসের জন্য তাহাদিগকে ঘরভাড়া দেওয়া হইবে না, যদি কেহ দেয়, তাহার প্রতি বিশেষরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল বাড়ী এসিয়ার লোকদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে। যে সকল হৌস্ ঐশিয়দিগকে কোনোপ্রকারে সাহায্য করে, খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এই নিয়মগুলি পালিত হয় এবং যাহাতে সভ্যগণ ঐশিয় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ হইতে কিছু না কেনে বা তাহাদিগকে কোনোপ্রকার সাহায্য না করে, সেজন্য একটা Vigilance Association বা চৌকিদারদল বাঁধিতে হইবে। সভায় বক্তৃতাকালে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমাদের সহরের মধ্যে ঐশিয় ব্যবসায়ীদিগকে যেমন করিয়া আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, এমন কি ইংলণ্ডের কোনো সহরে দেওয়া সম্ভব হইত? ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি কহিল, না, সেখানে তাহাদিগকে "লিঞ্চ্" করা হইত। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, এখানেও কুলিদিগকে "লিঞ্চ্" করাই শ্রেয়।

এশিয়ার প্রতি য়ুরোপের মনোভাবের এই যে সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহা লইয়া আমরা যেন অবোধের মত উত্তেজিত

হইতে না থাকি। এগুলি স্তব্ধভাবে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহা স্বভাবতই ঘটিতেছে, যাহা বাস্তবিক সত্য, তাহা লইয়া রাগারাগি করিয়া কোনো ফল দেখি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি ঘর করিতে হয়, তবে প্রকৃত অবস্থাটা ভুল বুঝিলে কাজ চলিবে না। ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, এশিয়াকে য়ুরোপ কেবলমাত্র পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হেয় বলিয়াই জানে।

এ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আছে। আমরা যাহাকে হেয়জ্ঞানও করি, নিজের গণ্ডির মধ্যে তাহার যে গৌরব আছে, সেটুকু আমরা অস্বীকার করি না। সে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন; তাহার ধর্ম্ম, তাহার আচার, তাহার বিধিব্যবস্থার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে; আমার মণ্ডলী আমার পক্ষে যেমন, তাহার মণ্ডলী তাহার পক্ষে ঠিক সেইরূপ,—এ কথা আমরা কখনো ভুলি না। এইজন্য যে সকল জাতিকে আমরা অনার্য্য বলিয়া ঘৃণাও করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আমরা তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে, আমাদের সমাজের মাঝখানেই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল স্বস্থানে আপন প্রাধান্য রক্ষা করিয়াই চিরদিন বজায় আছে।

পশুদিগকে আমরা নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই জানি, কিন্তু তবু বলিয়াছি —আমরাও আছি, তাহারাও থাক্; বলিয়াছি—প্রাণিহত্যা করিয়া আহার করাটা "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—সেটা একটা প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিটাই ভাল। য়ুরোপ বলে, জন্তুকে খাইবার অধিকার ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতার অভিমান ইতরকে যে কেবল ঘৃণা করে, তাহা নহে, তাহাকে নষ্ট করিবার বেলা ঈশ্বরকে নিজের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্ত্তব্য বলিয়া জানে। অন্যকে রক্ষা-করা যদি তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ্

খাইয়া যায়, তবেই অন্যের পক্ষে বাঁচোয়া, যে অংশে লেশমাত্র খাপ্ না খাইবে, সে অংশে দয়ামায়া-বাচবিচার নাই। হাতের কাছে ইহার যে দুইএকটা প্রমাণ আছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বাঙালি যে একদিন এমন জাহাজ তৈরি করিতে পারিত, যাহা দেখিয়া ইংরেজ ঈর্ষা অনুভব করিয়াছে, আজ বাঙালির ছেলে তাহা স্বপ্নেও জানে না। ইংরেজ যে কেমন করিয়া এই জাহাজনির্ম্মাণের বিদ্যা বিশেষ চেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের "দেশের কথা" নামক বই-খানি পড়িলে সকলে জানিতে পারিবেন। একটা জাতিকে, যে-কোনো দিকেই হৌক্, একেবারে অক্ষম পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সঙ্কোচ অনুভব করে নাই।

ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারুণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই। ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কত-বড় অধর্ম্ম, যাহারা এককালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল, তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্রপশুর নিকট শঙ্কিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্ম্মের দোহাই একেবারেই নিষ্ফল—কারণ জগতে অ্যাংলোস্তাক্সন্ জাতির মাহাত্ম্যকে বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করাই ইহারা চরম ধর্ম্ম জানে, সেজন্য ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মত নির্জ্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয়, তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দয়ামায়া নাই।

অ্যাংলোস্তাক্সন্ যে শক্তিকে সকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ

হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপহরণ করিয়া এদেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে—অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীরুতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীরুতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অতএব অনেকদিন হইতে ইহা দেখা যাইতেছে যে, অ্যাংলো-স্যাক্সন্‌-মহিমাকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব করিবার পক্ষে দূরতম ব্যাঘাতটি যদি আমাদের দেশের পক্ষে মহত্তম দুর্ম্মূল্য বস্তুও হয়, তবে তাহাকে দলিয়া সমভূম করিয়া দিতে ইহারা বিচারমাত্র করে না।

এই সত্যটি ক্রমে ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ গবর্মেণ্টের প্রত্যেক নড়াচড়ায় আমাদের হৃৎ-কম্প উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা মুখের কথায় যতই আশ্বাস দিতেছেন, আমাদের সন্দেহ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এমন করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, তবে উত্তর পাইবে, এক দলের দয়া না যদি হয় ত আর এক দলের দয়া হইতে পারে, প্রাতঃকালে যদি অনুগ্রহ না পাওয়া যায় ত যথেষ্ট অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকালে অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে। রাজা ত আমাদের একটি নয়, এইজন্য বারবার সহস্র-বার তাড়া খাইলেও আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না—এম্‌নি আমাদের মুস্কিল হইয়াছে।

কথাটা ঠিক। আমাদের একজন রাজা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভাগ্যে একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে। একটি বিদেশী জাতি আমাদের উপরে রাজত্ব করিতেছে,—একজন বিদেশী রাজা

নহে। একটি দূরবর্ত্তী সমগ্র জাতির কর্ত্তৃত্বভার আমাদিগকে বহণ করিতে হইতেছে। ভিক্ষাবৃত্তির পক্ষে এই অবস্থাটাই কি এত অনুকূল? প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যই কি মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়?

অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্ত্তৃভাবক। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিতে হয়। যিনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় প্রবৃত্ত, তাঁহাকে অনেক জনশ্রুতি, অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশ্বাসের জোরে খেদাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে তাঁহার বিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যিনি কর্ম্ম করিতে চান, অবিশ্বাসের নিড়ানির দ্বারা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক রাখিতে হয়। এই যে অবিশ্বাস, ইহা অন্যের উপরে অবজ্ঞা বা ঈর্ষ্যাবশত নহে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি, নিজের কর্ত্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।

আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজনীতিতে অবিশ্বাস যে কিরূপ প্রবল সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিতেছে এবং সেই অবিশ্বাস যে কিরূপ নির্মম-ভাবে আপনার লক্ষ্যসাধন করিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উচ্চ ধর্ম্মনীতির নহে, কিন্তু সাধারণ রাজনীতির দিক্ দিয়া দেখিলে এই কঠিন অটল অবিশ্বাসের জন্য ইংরেজকে দোষ দেওয়া যায় না। ঐক্যের যে কি শক্তি, কি মাহাত্ম্য, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তি-মাত্র নহে, পরন্তু এমন একটা আনন্দ আছে যে, সেই অনুভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত দুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অনু-ভূতির স্ফূর্ত্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধি-

কার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে সেইখানেই তাহা আমাদিগকে থাকিতে দেয় না—উচ্চতর অধিকারলাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই, সে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শত্রু। সে জানে যে, আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ দুর্ব্বলতার কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল্-হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষমতার অনুভূতিকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ অনুভব করিবে না, এ কথা বুঝিতে অধিক মননশক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে সকল পোলিটিকল্ প্রার্থনাসভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা যদি ভিক্ষুকের রীতিতেই ভিক্ষা করিত, তাহা হইলেও হয় ত মাঝে মাঝে দরখাস্ত মঞ্জুর হইত—কিন্তু তাহারা গর্জ্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশবিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুতরাং এই শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে ইংরেজ রাজা সাহস করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই ইহার শক্তির স্পর্দ্ধাকে লালন করা হয়—এইজন্য ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বরসহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া রাখিতে চান। এমন অবস্থায় এই সকল পোলিটিকাল্ সভা কৃতকার্য্যতার বল লাভ করিতে পারে না;—একত্র হইবার যে শক্তি, তাহা ক্ষণকালের জন্য পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে একটা যথার্থ সার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে স্ফূর্ত্তি, তাহা পায় না। সুতরাং নিষ্ফল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি ডিম্ব হইতে অকালে জাত অরুণের মত পঙ্গু হইয়াই থাকে—সে কেবল পরের রথেই জোড়া থাকিবার

উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উদ্যম থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল্—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে—আর, ষোলো-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে কঠিন শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা অশ্রদ্ধেয় তাহাকেও গ্রহণ করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার জন্য আমরা চিরদিন প্রস্তুত হইয়া আছি।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে, তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন বিরোধ-পরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুস্কিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।

যাহাই হউক, চিরন্তন প্রকৃতিবশত আমাদের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাউক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অনুকূল নহেন, এ কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। সেইজন্যই য়ুনিভার্সিটি-সংশোধন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গবর্মেন্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি খর্ব্ব করিবার সঙ্কল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

এমনতর সন্দিগ্ধ অবস্থার স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত—আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের

অবিশ্বাসের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাভের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে কেবল যে ফল পাওয়া যায় না, তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মশক্তির মাহাত্ম্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এইটেই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না, এ সুবুদ্ধিটা লজ্জাকর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে—অধিকাংশস্থলেই প্রার্থনাপূরণটাই আমাদের লোকসান। নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই, তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরেশপাথরও পাওয়া যায়। পরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তিহইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌরুষবশত, মনুষ্যত্ববশত, নিজের প্রতি, নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।

বস্তুত ইংরেজের উপরে রাগ করিয়া নিজের দেশের উপর হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করা কেমন—যেমন স্বামীর উপরে অভিমান করিয়া সবেগে বাপের বাড়ী যাওয়া। সে বেগের হ্রাস হইতে বেশিক্ষণ লাগে না, আবার দ্বিগুণ আগ্রহে সেই শ্বশুরবাড়ীতেই ফিরিতে হয়। দেশের প্রতি আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি, সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই তাহার গৌরব এবং স্থায়িত্ব, ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয়, তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড় কঠিন। ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট্ বাড়াইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে রাগ করিয়া যদি শরীর ভালো করিতে চেষ্টা করি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শরীরের প্রতি মমতা করিয়া যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হই, তবেই কাজটা যথার্থভাবে

সম্পন্ন হইবার এবং উৎসাহ স্থায়িভাবে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তবে কিনা, যেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বন্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর দ্বিতীয় ঝাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে—তেম্নি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপ্রবৃত্তাও হয় ত আমাদের সমাজে একটা বড়রকমের ঝাঁকানির অপেক্ষায় ছিল—হয় ত স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি এই ঝাঁকানির পর হইতে নিজের আভ্যন্তরিক শক্তিতেই আবার কিছুকাল সহজে চলিতে থাকিবে। অতএব এই ঝাঁকানিটা যাহাতে আমাদের মনের উপরে বেশ রীতিমত লাগে, সে পক্ষেও আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায্যে আমাদের নিত্য জীবনী ক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে, তবে এই সুযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।

এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা সথাসম্ভব বিলাতী জিনিষ-কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিষ কিনিবার জন্য যে সঙ্কল্প করিয়াছি, সেই সঙ্কল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্ত্তমান উদ্যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি, তবে তাহার কারণ এ নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে, তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে—এ সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে—সে সমস্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিক্‌টা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্ব্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশীজিনিষ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিষটা দেশী নহে, তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী-

জিনিষ-ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম, বিলাস, আত্মসুখতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিতব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল—আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্যদ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশীজিনিষ ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা—ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান্ সঙ্কল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।

এইরূপে কোনো একটা কর্ম্মের দ্বারা, কাঠিন্যের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আত্মনিবেদনের জন্য আমাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে—আমরা কেবলমাত্র সভা ডাকিয়া, কথা কহিয়া, আবেদন করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করি নাই। কথনো ভ্রমেও মনে করি নাই, ইহার দ্বারাই আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে—ইহার দ্বারা আমরা নিজের একটা শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি নাই—ইহা আমাদের চিত্তকে, আমাদের পূজার ব্যগ্রতাকে, আমাদের সুখদুঃখনিরপেক্ষ, ফলাফলবিচারবিহীন আত্মদানের ব্যাকুলতাকে দুর্নিবারবেগে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে নাই। কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তির প্রকৃতিতে, কি জাতির প্রকৃতিতে কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা অন্তরের অন্তরে বাস

করিতেছে—সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে, তাঁহার নির্ব্বাণহীন প্রদীপ জ্বলিতেছেই। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গহ্বর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ করিতে পারি, তখন আমাদের ভয় থাকে না, দ্বিধা থাকে না, তখনি আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি—নিজেকে আর দীনহীন দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সত্তার একমাত্র চরিতার্থতা।

নিশ্চয় জানি, এই বিপুল সার্থকতার জন্য আমরা সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছি। ইহারি অভাবে আমাদের সমস্ত দেশকে বিষাদে আচ্ছন্ন ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাঁরই অভাবে আমাদের মজ্জাগত দৌর্ব্বল্য যায় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ঘোচে না, আমাদের আত্মাভিমানের চপলতা কিছুতেই দূর হয় না। ইহারই অভাবে আমরা দুঃখবহন করিতে, বিলাসত্যাগ করিতে, ক্ষতিস্বীকার করিতে অসম্মত। ইহারই অভাবে আমরা প্রাণটাকে ভয়মুগ্ধ শিশুর ধাত্রীর মত একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, মৃত্যুকে নিঃশঙ্ক বীর্য্যের সহিত বরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই সূর্য্যালোকদীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাণীর দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষভাবে উদ্বোধিত করিতেছেন—আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শস্যক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্ত্তিকে পুরুষানুক্রমে আমাদের চক্ষের

সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে—আমাদের পুণ্যনদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দুমুসলমানখৃষ্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেষণ করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পর্দ্দা একবার একটু উড়িয়া যায়, তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি—দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক-ধনধান্য, এক সুখদুঃখ, এক বিরাট্ প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জ্জেয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরেজীস্কুলের ছাত্র নহেন, তিনি ইংরেজ রাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর দুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত, ইঁহার এই সহজমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনই আনন্দের প্রাচুর্য্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব, কোনো উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পরের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহার করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

আজ একটি আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনায় আঘাত করাতে আমরা যেন ক্ষণকালের জন্যও আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতার আভাস পাইয়াছি। সেইজন্য যাহারা কোনোদিন

চিন্তা করিত না, তাহারা চিন্তা করিতেছে ; যাহারা পরিহাস করিত, তাহারা স্তব্ধ হইয়াছে ; যাহারা কোনো মহান্ সঙ্কল্পের দিকে তাকাইয়া কোনোরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে জানিত না, তাহারাও যেন কিছু অসুবিধা ভোগ করিবার জন্য উদ্যম অনুভব করিতেছে এবং যাহারা প্রত্যেক কথাতেই পরের দ্বারে ছুটিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, তাহারাও আজ কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত নিজের শক্তি সন্ধান করিতেছে।

একবার এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা ভাল করিয়া মনের মধ্যে অনুভব করিয়া দেখুন্। ইতিপূর্ব্বে রাজার কোনো অপ্রিয় ব্যবহারে বা কোনো অনভিমত আইনে আঘাত পাইয়া আমরা অনেকবার অনেক কল-কৌশল, অনেক কোলাহল, অনেক সভা আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ বল পায় নাই, আমরা নিজের চেষ্টাকে নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এইজন্য সহস্র অত্যুক্তিদ্বারাও রাজার প্রত্যয় আকর্ষণ করিতে পারি নাই, দেশেরও ঔদাসীন্য দূর করিতে পারি নাই। আজ আসন্ন বঙ্গবিভাগের উদ্যোগ বাঙালির পক্ষে পরম শোকের কারণ হইলেও এই শোক আমাদিগকে নিরুপায় অবসাদে অভিভূত করে নাই। বস্তুত বেদনার মধ্যে আমরা একটা আনন্দই অনুভব করিতেছি। আনন্দের কারণ, এই বেদনার মধ্যে আমরা নিজেকে অনুভব করিতেছি,—পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি না। আনন্দের কারণ, আমরা আভাস পাইয়াছি আমাদের নিজের একটা শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবে আজ আমরা ত্যাগ করিবার, দুঃখভোগ করিবার পরম অধিকার লাভ করিয়াছি। আজ আমাদের বালকেরাও বলিতেছে—পরিত্যাগ কর, বিদেশের বেশভূষা, বিদেশের বিলাস পরিহার কর—সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধেরাও তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতেছে না, বিজ্ঞেরাও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে না ;—এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলিবার এবং এই কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিবার বল আমরা

কোথা হইতে পাইলাম! সুখেই হউক্ আর দুঃখেই হউক্, সম্পদেই হউক্ আর বিপদেই হউক্, হৃদয়ে হৃদয়ে যথার্থভাবে মিলন হইলেই যাঁহার আবির্ভাব আর মুহূর্ত্তকাল গোপন থাকে না, তিনি আমাদিগকে বিপদের দিনে এই বল দিয়াছেন,—দুঃখের দিনে এই আনন্দ দিয়াছেন। আজ দুর্যোগের রাত্রে যে বিদ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে, সেই আলোকে যদি আমরা রাজপ্রাসাদের সচিবদেরই মুখমণ্ডল দেখিতে থাকিতাম তবে আমাদের অন্তরের এই উদার উদ্যমটুকু কখনই থাকিত না। এই আলোকে আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি—সেইজন্যই আজ আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিন নহে, কিন্তু সঙ্কটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরের শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে, তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, দুর্ব্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ্ আছে, এবং দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি, সেই জাগ্রত পুরুষ, কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ আছেন। তাঁহার অনুশাসন এ নয় যে, গবর্মেণ্ট তোমাদের মানচিত্রের মাঝখানে যে একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন, তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া-কহিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া, বিলাতি-জিনিষ-কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও দূত পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই রেখা মুছিয়া কও। তাঁহার অনুশাসন এই যে, বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিন্, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে—আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে। রাজার দ্বারা বঙ্গবিভাগ ঘটিতেও পারে, না-ও ঘটিতে পারে—তাহাতে অতিমাত্র বিষণ্ণ বা উল্লসিত হইয়ো না—তোমরা যে আজ একই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছ, ইহাতেই আনন্দিত

হও এবং সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য সকলের মনে একই উদ্যম জন্মিয়াছে, ইহার দ্বারাই সার্থকতা লাভ কর!

অতএব এখন কিছুদিনের জন্য কেবলমাত্র একটা হৃদয়ের আন্দোলন ভোগ করিয়া এই শুভ সুযোগকে নষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিবে না। আপনাকে সংবরণ করিয়া, সংযত করিয়া এই আবেগকে নিত্য করিতে হইবে। আমাদের যে ঐক্যকে একটা আঘাতের সাহায্যে দেশের আদ্যন্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অনুভব করিয়াছি,—আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালী বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছি, আঘাতের কারণ দূর হইলেই বা বিস্মৃত হইলেই সেই ঐক্যের চেতনা যদি দূর হইয়া যায়, তবে আমাদের মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই। এখন হইতে আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, সহরবাসী ও পল্লিবাসী, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব। বিচ্ছেদে প্রেমকে ঘনিষ্ঠ করে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের মধ্য দিয়া যে প্রবল মিলন সঙ্ঘটিত হইতে থাকে, তাহা সচেষ্ট, জাগ্রত, বৈদ্যুতশক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয়, তবে সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সদ্ভাবে আরো দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, সেই চেষ্টার উদ্রেকই আমাদের পরম লাভ।

কিন্তু অনির্দ্দিষ্টভাবে, সাধারণভাবে এ কথা বলিলে চলিবে না। মিলন কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর কোনো উপায় নাই।

দেশের কার্য্য বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না—এখন সে দিন

নাই,—আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ এই, সাধ্যগত নিজেদের অভাবমোচন করা, নিজেদের কর্ত্তব্য নিজে সাধন করা।

এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্ম্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্ত্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব—তাঁহাদিগকে কর দান করিব, তাঁহাদের আদেশ পালন করিব, নির্ব্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব—তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

আমি জানি, আমার এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্তই সহজ, যাহাতে দুঃখ নাই, ত্যাগ নাই, অথচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা ছাড়া আর কিছুকেই আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলায় একটা দেশব্যাপী ক্ষোভ জন্মিয়াছে, সেই জন্যই আমি বিরক্তি ও বিদ্রূপ উদ্রেকের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং আশ্বস্ত করিবার জন্য একটা ঐতিহাসিক নজিরও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি যে বিবরণটি পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা রুশীয় গবর্মেণ্টের অধীনস্থ বাহ্লীকপ্রদেশীয়। ইহা কিছুকাল পূর্ব্বে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বাহ্লীকপ্রদেশে জর্জ্জীয় আর্ম্মাণিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে না, তাহা জানি না! সেখানে "সকার্‌ট্‌ভেলিষ্টি"নামধারী একটি জর্জ্জীয় "ন্যাশনালিষ্ট"সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে—ইঁহারা "কার্স্‌" প্রদেশে প্রত্যেক গ্রামাজিলায় স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপনবিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন।

The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have the invaluable characteristic of incorruptibility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist party, had previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the Government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the supression of Armenian schools by the Russian minister of Education Delyanoff, who by the way, was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own.

আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি—অর্থাৎ ইহার মধ্যে এইটুকুই দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্ম্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগ্‌লামী নহে—বস্তুত দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতলোকে যে গবর্মেণ্টের চাকরীতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না, কেবল চাকরীর পথ আরো প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিব? চাকরীর খাতিরে আমাদের দুর্ব্বলতা কতদূর বাড়িতেছে, তাহা কি আমরা জানি না? আমরা মনিবকে খুসী করিবার জন্য

গুপ্তচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হাত তুলিতেছি এবং যে মনিব আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করে, তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমান-জনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি—এই চাকরী আরো বিস্তার করিতে হইবে? দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিতে হইবে? আমরা যদি স্বদেশের কর্ম্মভার নিজে গ্রহণ করিতাম, তবে গবর্মেণ্টের আপিস রাক্ষসের মত আমাদের দেশের শিক্ষিত-লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাস করিত? আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরী নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে! যাহাতে আমাদের ডাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার স্ফূর্ত্তিসাধন করিতে পারেন, আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের যে কি শক্তি আছে, তাহার পরিচয়ই আমরা পাইব না। তা ছাড়া, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সেবার অভ্যাসের দ্বারাই প্রীতির উপচয় হয়; যদি আমরা শিক্ষিতগণ এমন কোথাও কাজ করিতাম, যেখানে দেশের কাজ করিতেছি, এই ধারণা সর্ব্বদা স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকিত, তবে দেশকে ভালবাস, এ কথা নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে উপদেশ দিতে হইত না। তবে, একদিকে যোগ্যতার অভিমান করা, অন্যদিকে প্রত্যেক অভাবের জন্য পরের সাহায্যের প্রার্থী হওয়া—এমনতর অদ্ভুত অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না, দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইত এবং শিক্ষিতসমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।

জজ্জিয়গণ, আর্ম্মাণিগণ প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে, আমরা কি সেই সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না? কৃষিতত্ত্ব-পারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না?

আমাদের ডাক্তারি লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধানচেষ্টা কি আমা-দের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লির শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলায়-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিশ-নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাধিতে পারি। এই দল, এই কর্ত্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে—নতুবা বলিব, আজ আমরা যে একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি, তাহা মাদকতামাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশয্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে।

একটা কথা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, পরের প্রদত্ত অধিকার আমাদের জাতীয়সম্পদ্রূপে গণ্য হইতে পারে না—বরঞ্চ তাহার বিপরীত! দৃষ্টান্তস্বরূপে একবার পঞ্চায়েৎবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন। এক সময় পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ গবর্মেণ্টের আপিসে-গড়া জিনিষ হইতে চলিল। যদি ফল বিচার করা যায়, তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পর-স্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেণ্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিষ হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মত চাপিয়া বসিবে—তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়েৎপদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে, যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে—পঞ্চায়েৎ, ম্যাজিষ্ট্রেট্বর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপরপক্ষ বলিয়া জানিবে, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে—ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েৎ এদেশে

গ্রামের বলস্বরূপ ছিল, সেই পঞ্চায়েৎই গ্রামের দুর্ব্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্ত্তমান আছে—যে পঞ্চায়েৎ কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত—যে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগণ একদিন স্বদেশের সাধারণকার্য্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত, সেই সকল গ্রামের পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেণ্টের বেনো-জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়তত্ব চিরদিনের মত ঘুচিল। দেশের জিনিষ হইয়া তাহারা যে কাজ করিত, গবর্মেণ্টের জিনিষ হইয়া সম্পূর্ণ উল্টারকম কাজ করিবে।

ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, দেশের হাত হইতে আমরা যে ক্ষমতা পাই, তাহার প্রকৃতি একরকম, আর পরের হাত হইতে যাহা পাই, তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম হইবেই। কারণ, মূল্য না দিয়া কোনো জিনিষ আমরা পাইতেই পারি না। সুতরাং দেশের কাছ হইতে আমরা যাহা পাইব, সেজন্য দেশের কাছেই আপনাকে বিকাইতে হইবে—পরের কাছ হইতে যাহা পাইব, সেজন্য পরের কাছ না বিকাইয়া উপায় নাই। এইরূপ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয়, তবে শিক্ষাকে পরের গোলামি করিতেই হইবে—যাহা স্বাভাবিক, তাহার জন্য আমরা বৃথা চীৎকার করিয়া মরি কেন?

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটা কথা বলি। মহাজনেরা চাষীদের অধিক সুদে কর্জ্জ দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, আমরা প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় জানি না—অতএব গবর্মেণ্টকেই অথবা বিদেশী মহাজনদিগকে যদি আমরা বলি যে, তোমরা অল্পসুদে আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন কর, তবে নিজে থর্দ্দের ডাকিয়া আনিয়া আমাদের

দেশের চাষীদিগকে নিঃশেষে পরের হাতে বিকাইয়া দেওয়া হয় না? যাহারা যথার্থই দেশের বল, দেশের সম্পদ্, তাহাদের প্রত্যেকটিকে কি পরের হাতে এম্‌নি করিয়া বাঁধা রাখিতে হইবে? আমরা যে পরিমাণেই দেশের কাজ পরকে দিয়া করাইব, সেই পরিমাণেই আমরা নিজের শক্তিকেই বিকাইতে থাকিব, দেশকে স্বেচ্ছাকৃত অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বাঁধিতে থাকিব, এ কথা কি বুঝাই এতই কঠিন? পরের প্রদত্ত ক্ষমতা আমাদের পক্ষে উপস্থিত অসুবিধার কারণ যেমনই হৌক্, তাহা আমাদের পক্ষে ছদ্মবেশী অভিসম্পাত, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে, আমাদের মোহজাল ততই দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠিতে থাকিবে।

অতএব আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারী পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্ব্বেই আমাদের নিজের পল্লি-পঞ্চায়েৎকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্ব্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে—কারণ, এস্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্ব্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।

একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বিদেশী শাসনকালে বাংলা-দেশে যদি এমন কোনো জিনিষের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহা লইয়া বাঙালী যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলাসাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ, বাংলাসাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেক বাংলা বই সরকার তিনখানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে পাই

এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। গবর্মেণ্টের উপাধি, পুরস্কার, প্রসাদের প্রলোভন বাংলাসাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই, এই সাহিত্য বাঙালীর স্বাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই সাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি। হয় ত গণনায় বাংলাভাষার উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থসংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয় ত বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পৎ-শালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু তবু ইহাকে আমরা বর্ত্তমান অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বড় করিয়া দেখিতে পাই, কারণ, ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে, নিজের অন্তরের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এ ক্ষীণ হউক্, দীন হউক্, এ রাজার প্রশ্রয়ের প্রত্যাশী নহে, আমাদেরই প্রাণ ইহাকে প্রাণ জোগাইতেছে। অপর পক্ষে, আমাদের বাংলাবইগুলির প্রতি ন্যূনাধিকপরিমাণে অনেকদিন হইতেই সরকারের, গুরুহস্তের ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে স্কুলবইগুলির কিরূপ শ্রী বাহির হইতেছে, তাহা কাহারো অগোচর নাই।

এই যে স্বাধীন বাংলাসাহিত্য, যাহার মধ্যে বাঙালী নিজের প্রকৃত শক্তি যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়িজালের মত বাংলার পূর্ব্বপশ্চিম, উত্তরদক্ষিণকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে এক চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে; যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভাস্থাপন হয়, তবে বাংলাসাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলাসাহিত্যের পুষ্টিসাধন সভ্যগণের একটি বিশেষ কার্য্য হইবে। বাংলাভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলাসাহিত্য যত উন্নত-সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালীজাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার

অনশ্বর আধার হইবে। বৈষ্ণবের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশিরাম দাসের মহাভারত আজ পর্য্যন্ত এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।

আমি জানি, সমস্ত বাংলাদেশ একমুহূর্ত্তে একত্র হইয়া আপনার নায়ক নির্ব্বাচনপূর্ব্বক আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এখন আর বাদবিবাদ-তর্কবিতর্ক না করিয়া আমরা যে কয়জনেই উৎসাহ অনুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার করি, সেই পাঁচদশ জনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্ব্বাচন করিব, তাঁহার নিয়োগক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্ত্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে আপনার পরিবার, প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধানসম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির বিক্রয়ভাণ্ডার (Co-operative Store), ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিশ-নিষ্পত্তির সভা ও নির্দ্দোষ আমোদের মিলন-গৃহ থাকিবে।

এম্‌নি করিয়া যদি আপাতত খণ্ডখণ্ডভাবে দেশের নানাস্থানে এই-রূপ একএকটি কর্ত্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই সমস্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগসূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গ-প্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতে-ছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে—এবং পর্য্যায়ক্রমে একএকটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য,

ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার—এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্ত্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

যখন দেখা যাইতেছে, বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিয়ত সতর্ক রহিয়াছে, তখন তাহার প্রতিকারের জন্য নানারূপে কেবলি দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে গুণে মানুষকে একত্র করে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলি অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারো চেয়ে ন্যূন মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস—এইগুলিই সেই সয়তানের প্রদত্ত বিষ, যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে। ঐক্যরক্ষার জন্য আমাদিগকে অযোগ্যের কর্ত্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে—ইহাতে মহান্ সঙ্কল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অযোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালীকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চ্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদাই অন্যকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে—আপনাকে খর্ব্ব করিয়া আপনাদিগকে বড় করিবার এই সাধনা, গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয় করিবার

এই সাধনা—ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে, তখন আমরা সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বের যথার্থরূপে যোগ্য হইব। ইহাও নিশ্চিত, যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোন শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যখন কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব, তখন আমরা দাসত্ব করিব—তা আমাদের প্রভু যত বড়ই প্রবল হউন্। জল যখন জমিয়া কঠিন হয়, তখন সে লোহার পাইপ্‌কেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মত তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শতশত শাখাপ্রশাখায় ধাবিত হইতেছি—জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধনকে হার মানিতেই হইবে।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন, এই পূর্ব্বপশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব্বপশ্চিম, জননীর বামদক্ষিণ স্তনের ন্যায়, চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমাদের কিছুতেই পৃথক্ করিতে পারে, এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোন কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পরে না। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের একটা-কিছু করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি যদি আমাদের সকলদিকে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল বলিয়া আশঙ্কা করি, তবে কোন কৌশললব্ধ সুযোগে, কোন প্রার্থনা-

লব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে অধিকদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে না, তখনি ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতি-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, তখনি ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্য—তখনি অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জ্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা কেহ করিয়ো না—আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—বিধাতার রুদ্রমূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।

———

ব্রতধারণ। *

আজ এই স্ত্রীসমাজে আমি যে উপদেশ দিতে উঠিয়াছি বা আমার কোনো নূতন কথা বলিবার আছে, এমন অভিমান আমার নাই।

আমার কথা নূতন নহে বলিয়াই, কাহাকেও উপদেশ দিতে হবে না বলিয়াই, আমি আজ সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিয়া আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

যে কথাটি আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সর্ব্বত্র জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকেই নারীসমাজের নিকট সুস্পষ্টরূপে গোচর করিয়া তুলিবার জন্যই আমাদের অদ্যকার এই উদ্যোগ।

আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশে আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের যাত্রাপথের দিক্‌পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

যে সময়ে এইরূপ দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে আমাদের সকলেরই হৃদয় কিছু না কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়কে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহাকে দুর্যোগ বলিব কি? এই যে দিগ্‌দিগন্তে ঘন মেঘ করিয়া শ্রাবণের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, এই যে বিদ্যুতের আলোক এবং বজ্রের গর্জ্জন আমাদের হৃৎপিণ্ডকে চকিত করিয়া তুলিতেছে, এই যে, জলধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া গেল—এই দুর্যোগকেই যাহারা সুযোগ করিয়া তুলিয়াছে, তাহারাই পৃথিবীর অন্ন যোগাইবে। এখনি স্কন্ধে

* কোন "স্ত্রীসমাজে" জনৈক-মহিলা-কর্ত্তৃক পঠিত।

হল লইয়া কৃষককে কোমর বাঁধিতে হইবে। এই সময়টুকু যদি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয়, তবে সমস্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ এবং হাহাকার।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈশ্বর দুর্যোগের বেশে যে সুযোগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্য শক্তিকেও যথাসম্ভব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। যে এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে,—কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে।

নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই। বড় দুঃখে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা যাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়,—নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"। আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালী এ কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কোনই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা, তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।

এই আঘাত আবার একদিন হয় ত সহ্য হইয়া যাইবে—অপমানে যাহা শিখিয়াছি, তাহা হয় ত আবার ভুলিয়া গিয়া আবার গুরুতর অপমানের জন্য প্রস্তুত হইব। যে দুর্ব্বল, নিশ্চেষ্ট, তাহার ইহাই দুর্ভাগ্য—দুঃখ তাহাকে দুঃখই দেয়, শিক্ষা দেয় না। আজ সেই শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সময় থাকিতে এই দুঃসময়ের দান গ্রহণ করিবার জন্য আমরা একত্র হইয়াছি।

কোথায় আমরা আপনারা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি এবং

কোন্‌দিকে আমাদের অসম্মান ও প্রতিকূলতা, আজ দৈবকৃপায় যদি তাহা আমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে কেবল তাহাকে ক্ষীণ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। কারণ, শুদ্ধমাত্র ইহাকে মনের মধ্যে রাখিলে ক্রমে ইহা কেবল কথার কথা এবং অবশেষে একদিন ইহা বিস্মৃত ও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ইহাকে চিরদিনের মত আমাদিগকে মনে গাঁথিতে এবং কাজে খাটাইতে হইবে। ইহাকে ভুলিলে আমাদের কোনোমতেই চলিবে না—তাহা হইলে আমরা মরিব।

কাজে খাটাইতে হইবে। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক—পুরুষের মত আমাদের কার্য্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে। জানি না, আজিকার দুর্দ্দিনে আমাদের পুরুষেরা কি কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? জানি না, এখনো তাঁহারা যথার্থ মনের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন কি না যে—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।"

যে নির্জ্জীব, যে সহজ পথ খুঁজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতেই চায়, তাহাকে ভুলাইবার জন্য আশাকে অধিক-বেশি ছলনা বিস্তার করিতে হয় না। সে হয় ত এখনো মনে করিতেছে, যদি এখানকার রাজদ্বার হইতে ভিক্ষুককে তাড়া খাইতে হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্রপারে যাইতে হইবে। সমুদ্রের এ পারেই কি, আর ও-পারেই কি, অনন্যশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।

কি এ দশা আমাদের পুরুষদের মধ্যে সকলের নহে—তাঁহাদের বহুদিনের বিশ্বাসক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে, তাঁহাদের আশা খিলানে-খিলানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেছে—এখন তাঁহারা ভাবিতেছেন, ইহার চেয়ে নিজের দীনহীন কুটীর আশ্রয় করাও নিরাপদ্‌। এখন তাই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের

শক্তিকে অবলম্বন করিবার জন্য একটা মর্ম্মভেদী আহ্বান উঠিয়াছে।

এই আহ্বানে পুরুষেরা কে কি ভাবে সাড়া দিবেন, তাহা জানি না—কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরেও কি এই আহ্বান প্রবেশ করে নাই? আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির কন্যা নহি? দেশের অপমান কি আমাদের অপমান নহে? দেশের দুঃখ কি আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাষাণ ভেদ করিতে পারিবে না?

ভগিনীগণ, আপনারা হয় ত কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি করিতে পারি—দুঃখের দিনে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করাই আমাদের সম্বল।

এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমরা যে কি না করিতেছি, তাই দেখুন! আমরা পরণের শাড়ী কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হ্যামিল্টন্, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতী দোকানের, আমরা শয়নে-স্বপনে বিলাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা প্রতিদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া বিলাতদেবতার পায়ে রাশিরাশি অর্ঘ্য যোগাইতেছি।

আমরা লড়াই করিতেও যাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ কথাও বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়,—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া-দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের বেশভূষার সখ্ মিটাইব না? আমরা, ভাল হউক্, মন্দ হউক্, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিষ ব্যবহার করিব।

ভগিনীগণ, সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দোহাই দিবেন না! সৌন্দর্য্যবোধ অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চজিনিষ আছে। আমি এ কথা স্বীকার করিব না যে, দেশী জিনিষে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ ক্লিষ্ট

হইবে ; কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাসক্রমে আমাদের সেইরূপই ধারণা হয়, তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্য্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড় করিবার দিন আজ নহে—সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত, তখন জননী বেনারসি শাড়ীখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন না—তখন কোথায় থাকে সৌন্দর্য্যবোধের দাবী ?

জানি, আমাকে অনেকে বলিবেন, কথাটা বলিতে যত সহজ, করিতে তত সহজ নহে। আমাদের অভ্যাস, আমাদের সংস্কার, আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ—ইহাদিগকে ঠেলিয়া-নড়ানো বড় কম কথা নহে।

নিশ্চয়ই তাহা নহে। ইহা সহজ নহে, ইহার চেয়ে একদিনের মত চাঁদার খাতায় সহি দেওয়া সহজ। কিন্তু বড় কাজ সহজে হয় না। যখন সময় আসে, তখন ধর্ম্মের শঙ্খ বাজিয়া উঠে, তখন, যাহা কঠিন তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। বস্তুত তাহাতেই আনন্দ, সহজ নহে বলিয়াই আনন্দ, দুঃসাধ্য বলিয়াই সুখ।

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুতমহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে, তখন সুবিধা বা সৌন্দর্য্যচর্চ্চার কথা ভাবে নাই—ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে স্ত্রীলোক যদিস্বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে—সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্ম্মের বীর্য্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যখন ভাবি, তখন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই—স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্য্যদ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।

আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দ্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ

করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া সৌখীনতা করিতে যাইব না।

দেশের জিনিষকে রক্ষা করা—এও ত রমণীর একটা বিশেষ কাজ। আমরা ভালবাসিতে জানি! ভালবাসা চাক্‌চিক্যে ভুলিয়া নূতনের কুহকে চারিদিকে ধাবমান হয় না। আমাদের যাহা আপন, সে সুশ্রী হউক্ আর কুশ্রী হউক্, নারীর কাছে অনাদর পায় না,—সংসার তাই রক্ষা পাইতেছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বঙ্গসাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসঙ্কোচে মাথা তুলিতে পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিতপুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তখন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্জার সহিত কৈফিয়ৎ দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাড়ীর ভিতরে মেয়েরা পড়িবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাঁহাদের সে লজ্জার ভার আমরাই বহন করিয়াছি, কিন্তু ত্যাগ করি নাই। আজ ত সে লজ্জার দিন ঘুচিয়াছে! যে বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের কোলে বাংলাদেশের শিশুসন্তানেরা তাহারা কালোই হউক্ আর ধলোই হউক্—পরম আদরে মানুষ হইয়া উঠিতেছে —বঙ্গসাহিত্যও সেই বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অন্নবস্ত্রের দুঃখ পায় নাই।

একবার ভাবিয়া দেখুন, যেখানে বাঙালিপুরুষ বিলাতী কাপড় পরিয়া সর্ব্বত্র নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন, সেখানে তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণ বিদেশীবেশ ধারণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজাতীয়বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হইবে, ইহা আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির সঙ্গে এতই একান্ত অসঙ্গত যে, বিলাতের মোহে আপাদমস্তক বিকাইয়াছেন যে পুরুষ, তিনিও আপন স্ত্রীকন্যাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই, দেশের দেশীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মাতৃক্রোড়েই রক্ষা পায়। নূতনত্বের বন্যায় দেশের অনেক জিনিষ, যাহা পুরুষসমাজ হইতে ভাসিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃতকক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। এই বন্যার উপদ্রব একদিন যখন দূর হইবে, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের খোঁজ পড়িবে এবং দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

অতএব আজ আমরা যদি আর সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প, দেশের সামগ্রীকে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করি, তবে তাহাতে নারীর কর্ত্তব্যপালন করা হইবে।

আমার মনে এ আশঙ্কা আছে যে, আমাদের মধ্যেও অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন, তোমরা কয়জনে দেশীজিনিষ ব্যবহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিলেই অমনি নাকি ম্যাঞ্চেষ্টর্ ফতুর হইয়া যাইবে এবং লিভার্‌পুল্ বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!

সে কথা জানি। ম্যাঞ্চেষ্টরের কল চিরদিন ফুঁসিতে থাক্, রাবণের চিতার ন্যায় লিভার্‌পুলের এঞ্জিনের আগুন না নিভুক্! আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাতির পরিবর্ত্তে দেশীজিনিষ ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাতকে দেউলে করিয়া দিতে চান্। বস্তুত আমাদের এই যে চেষ্টা, ইহা কেবল আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্ত্তিমান্ করিয়া রাখিবার চেষ্টা। আমরা সহজে না হউক্, অন্তত বারংবার আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি, সেই ঔৎসুক্যকে যে কায়ে-মনে-বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে—নতুবা দুইদিনেই তাহা যে বিস্মৃত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের মন্ত্রও চাই, চিহ্নও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।

বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না, আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে, যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রসাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই সকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম, ততদিন আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতেই থাকিতাম। আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না; যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করিব, ততদিন পর্য্যন্ত পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।

যে আপনার শক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাকে নিরুপায়ভাবে পরের পশ্চাতে ফিরিতে হয়, ঈশ্বর করুন, সে যেন আরাম ভোগ না করে—সে যেন অহঙ্কার অনুভব না করে! অপমান ও ক্লেশ তাহাকে সর্ব্বদা যেন এই কথা স্মরণ করাইতে থাকে যে, তোমার নিজের শক্তি নাই, তোমাকে ধিক্! আমরা যে অপমানিত হইতেছি, ইহাতে বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর এখনো আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু আমরা আর বিলম্ব যেন না করি! আমরা নিজেকে ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়কে অনুকূল যেন করিতে পারি। আমরা যেন পরের অনুকরণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিষে গৌরববোধ না করি। বিলাতী আস্‌বাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে সে কষ্টই আমাদের মন্ত্রকে ভুলিতে দিবে না। সেই মন্ত্রটি, এই—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।

যাহা-কিছু পরবশ, তাহাই দুঃখ; যাহা-কিছু আত্মবশ, তাহাই সুখ।

আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্যকামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালীর সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্য সেইরূপ ব্রত-গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যায় দেশের মঙ্গল হইবে—তবে এই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।

দেশীয় রাজ্য।

দেশভেদে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভেদ হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। সেই ভেদকে স্বীকার না করিলে কাজ চলে না। যাহারা বিলখালের মধ্যে থাকে, তাহারা মৎস্যব্যবসায়ী হইয়া উঠে; যাহারা সমুদ্রতীরের বন্দরে থাকে, তাহারা, দেশবিদেশের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; যাহারা সমতল উর্ব্বরাভূমিতে বাস করে, তাহারা কৃষিকে উপজীবিকা করিয়া তোলে। মরুপ্রায় দেশে যে আরব বাস করে, তাহাকে যদি অন্যদেশবাসীর ইতিহাস শুনাইয়া বলা যায় যে, কৃষির সাহায্য ব্যতীত উন্নতিলাভ করা যায় না, তবে সে উপদেশ ব্যর্থ হয় এবং কৃষিযোগ্য স্থানের অধিবাসীর নিকট যদি প্রমাণ করিতে বসা যায় যে, মৃগয়া এবং পশুপালনেই সাহস ও বীর্য্যের চর্চ্চা হইতে পারে, কৃষিতে তাহা নষ্টই হয়, তবে সেরূপ নিষ্ফল উত্তেজনা কেবল অনিষ্টই ঘটায়।

বস্তুত ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন জাতি ভিন্ন শ্রেণীর উৎকর্ষ লাভ করে—এবং সমগ্র মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভের এই একমাত্র উপায়। য়ুরোপ কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধাবশত যে বিশেষপ্রকারের উন্নতির অধিকারী হইয়াছে, আমরা যদি ঠিক সেইপ্রকার উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি, তবে নিজেকে ব্যর্থ ও বিশ্বমানবকে বঞ্চিত করিব। কারণ, আমাদের দেশের বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে আমরা মনুষ্যত্বের যে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, পরের বৃথা অনুকরণচেষ্টায় তাহাকে নষ্ট করিলে এমন একটা জিনিষকে নষ্ট করা হয়, যাহা মানুষ অন্য কোনো স্থান হইতে পাইতে পারে না। সুতরাং বিশ্বমানব সেই অংশে দরিদ্র হয়। চাষের জমিকে খনির মত ব্যবহার করিলে ও খনিজের জমিকে কৃষিক্ষেত্রের কাজে লাগাইলে মানবসভ্যতাকে ফাঁকি দেওয়া হয়।

যে কারণেই হউক্, য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের কতকগুলি গুরুতর প্রভেদ আছে। উৎকট অনুকরণের দ্বারা সেই প্রভেদকে দূর করিয়া দেওয়া যে কেবল অসম্ভব, তাহা নহে, দিলে তাহাতে বিশ্বমানবের ক্ষতি হইবে।

আমরা যখন বিদেশের ইতিহাস পড়ি বা বিদেশের প্রতাপকে প্রত্যক্ষচক্ষে দেখি, তখন নিজেদের প্রতি ধিক্কার জন্মে—তখন বিদেশীর সঙ্গে আমাদের যে যে বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাই, সমস্তই আমাদের অনর্থের হেতু বলিয়া মনে হয়। কোনো অধ্যাপকের অর্ব্বাচীন বালকপুত্র যখন সার্কাস্ দেখিতে যায়, তাহার মনে হইতে পারে যে, এম্‌নি করিয়া ঘোড়ার পিঠের উপরে দাঁড়াইয়া লাফালাফি করিতে যদি শিখি এবং দর্শকদলের বাহাবা পাই, তবেই জীবন সার্থক হয়। তাহার পিতার শান্তিময় কাজ তাহার কাছে অত্যন্ত নির্জ্জীব ও নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ স্থলে পিতাকে ধিক্কার দিবার কারণ থাকিতেও পারে।

সার্কাসের খেলোয়াড় যেরূপ অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজের ব্যবসায়ে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, সেইরূপ উদ্যম ও উদ্যোগের অভাবে অধ্যাপক যদি নিজের কর্ম্মে উন্নতিলাভ না করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া চলে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য অনুভব করিয়া যদি আমাদের লজ্জা পাইতে হয়, তবে লজ্জার কারণটা ভাল করিয়া বিচার করিতে হয়, নতুবা যথার্থ লজ্জার মূল কখনই উৎপাটিত হইবে না। যদি বলি যে, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট আছে, ইংলণ্ডের যৌথকারবার আছে, ইংলণ্ডে প্রায় প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনায় কিছু-না-কিছু অধিকারী, এইজন্য তাহারা বড়, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোট, তবে গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কৌতুকপ্রিয় দেবতার বরে যদি কয়েকদিনের জন্য মূঢ় আবুহোসেনের মত ইংরেজিমাহাত্ম্যের বাহ্য অধিকারী হই—আমাদের বন্দরে বাণিজ্যতরীর আবির্ভাব হয়—পার্লামেণ্টের গৃহচূড়া আকাশভেদ করিয়া উঠে, তবে প্রথম অঙ্কের প্রহসন পঞ্চম অঙ্কে কি মর্ম্মভেদী অশ্রুপাতেই অবসিত হয়! আমরা এ কথা যেন কোনোমতেই না মনে করি যে, পার্লামেণ্টে মানুষ গড়ে—বস্তুত মানুষই পার্লামেণ্ট গড়ে। মাটি সর্ব্বত্রই সমান; সেই মাটি লইয়া কেহ বা শিব গড়ে, কেহ বা বানর গড়ে; যদি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে মাটির পরিবর্ত্তন নহে, যে ব্যক্তি গড়ে, তাহার শিক্ষা ও সাধনা, চেষ্টা ও চিন্তার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই ত্রিপুররাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃতবাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি—"কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং"—বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেণ্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশকালপাত্রভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়—কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে

বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর, কেহ বা কর্ম্মে বীর। বর্ত্তমানে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রতিভাকে আমরা পূর্ণ উৎকর্ষের দিকে লইয়া যাইতে পারিতেছি না, তাহার কতকগুলি কারণ আছে—কিন্তু সর্ব্বপ্রধান কারণ বীর্য্যের অভাব। এই বীর্য্যের দারিদ্র্যবশত যদি নিজের প্রকৃতিকেই ব্যর্থ করিয়া থাকি, তবে বিদেশের অনুকৃতিকে সার্থক করিয়া তুলিব কিসের জোরে?

আমাদের আমবাগানে আজকাল আম ফলে না, বিলাতের আপেল-বাগানে প্রচুর আপেল ফলিয়া থাকে। আমরা কি তাই বলিয়া মনে করিব যে, আমগাছগুলা কাটিয়া-ফেলিয়া আপেলগাছ রোপন করিলে তবেই আমরা আশানুরূপ ফললাভ করিব? এই কথা নিশ্চয় জানিতে হইবে, আপেলগাছে যে বেশি ফল ফলিতেছে, তাহার কারণ তাহার গোড়ায়, তাহার মাটিতে সার আছে—আমাদের আমবাগানের জমির সার বহুকাল হইল নিঃশেষিত হইয়া গেছে। আপেল পাই না, ইহাই আমাদের মূল দুর্ভাগ্য নহে; মাটিতে সার নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। সেই সার যদি যথেষ্টপরিমাণে থাকিত, তবে আপেল ফলিত না, কিন্তু আম প্রচুর পরিমাণে ফলিত এবং তখন সেই আম্রের সফলতায় আপেলের অভাব লইয়া বিলাপ করিবার কথা আমাদের মনেই হইত না। তখন দেশের আম বেচিয়া অনায়াসে বিদেশের আপেল হাটে কিনিতে পারিতাম, ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়া একরাত্রে পরের প্রসাদে বড়লোক হইবার দুরাশা মনের মধ্যে বহন করিতে হইত না।

আসল কথা, দেশের মাটিতে সার ফেলিতে হইবে। সেই সার আর কিছুই নহে—"কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং"—বীরতাকেই একমাত্র সার বলিয়া জানিবে। ঋষিরা বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই যে আত্মা, ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন।

বিশ্বাত্মা, পরমাত্মার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্—যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, সে নিজের আত্মাকে পায় না—নিজের আত্মাকে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়াছে, সে অপর কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। য়ুরোপ নিজের আত্মাকে যে পথ দিয়া লাভ করিতেছে, সে পথ আমাদের সম্মুখে নাই; কিন্তু যে মূল দিয়া লাভ করিতেছে, তাহা আমাদের পক্ষেও অত্যাবশ্যক—তাহা বল, তাহা বীর্য্য। য়ুরোপ যে কর্ম্মের দ্বারা যে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছে, আমরা সে কর্ম্মের দ্বারা সে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিব না—আমাদের সম্মুখে অন্য পথ, আমাদের চতুর্দ্দিকে অন্যরূপ পরিবেষ, আমাদের অতীতের ইতিহাস অন্যরূপ, আমাদের শক্তির মূলসঞ্চয় অন্যত্র—কিন্তু আমাদের সেই বীর্য্য আবশ্যক, যাহা থাকিলে পথকে ব্যবহার করিতে পারিব, পরিবেষকে অনুকূল করিতে পারিব, অতীতের ইতিহাসকে বর্ত্তমানে সফল করিতে পারিব, এবং শক্তির গূঢ়সঞ্চয়কে আবিষ্কৃত-উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহার অধিকারী হইতে পারিব। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" —আত্মা ত আছেই, কিন্তু বল নাই বলিয়া তাহাকে লাভ করিতে পারি না। ত্যাগ করিতে শক্তি নাই, দুঃখ পাইতে সাহস নাই, লক্ষ্য অনুসরণ করিতে নিষ্ঠা নাই;—কৃশ সঙ্কল্পের দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণশক্তির আত্মবঞ্চনা, সুখবিলাসের ভীরুতা, লোকলজ্জা, লোকভয় আমাদিগকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যথার্থভাবে আত্মপরিচয়, আত্মলাভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দূরে রাখিতেছে। সেইজন্যই ভিক্ষুকের মত আমরা অপরের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ষা করিতেছি এবং মনে করিতেছি, বাহ্য অবস্থা যদি দৈবক্রমে অন্যের মত হয়, তবেই আমাদের সকল অভাব, সকল লজ্জা দূর হইতে পারে।

বিদেশের ইতিহাস যদি আমরা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব, মহত্ত্ব কত বিচিত্রপ্রকারের—গ্রীসের মহত্ত্ব এবং রোমের

মহত্ত্ব একজাতীয় নহে—গ্রীস্ বিদ্যা ও বিজ্ঞানে বড়, রোম কর্ম্মে ও বিধিতে বড়। রোম তাহার বিজয়পতাকা লইয়া যখন গ্রীসের সংস্রবে আসিল, তখন বাহুবলে ও কর্ম্মবিধিতে জয়ী হইয়াও বিদ্যাবুদ্ধিতে গ্রীসের কাছে হার মানিল, গ্রীসের কলা-বিদ্যা ও সাহিত্যবিজ্ঞানের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তবু সে রোমই রহিল, গ্রীস্ হইল না—সে আত্মপ্রকৃতিতেই সফল হইল, অনুকৃতিতে নহে—সে লোক-সংস্থানকার্য্যে জগতের আদর্শ হইল, সাহিত্যবিজ্ঞান-কলাবিদ্যায় হইল না।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, উৎকর্ষের একমাত্র আকার ও একমাত্র উপায় জগতে নাই। আজ য়ুরোপীয় প্রতাপের যে আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে, উন্নতি তাহা ছাড়াও সম্পূর্ণ অন্যআকারের হইতে পারে—আমাদের ভারতীয় উৎকর্ষের যে আদর্শ আমরা দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার, বলসঞ্চার করিলে জগতের মধ্যে আমাদিগকে লজ্জিত থাকিতে হইবে না। একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা, ধর্ম্মের দ্বারা চীন-জাপান, ব্রহ্মদেশ-শ্যামদেশ, তিব্বত-মঙ্গোলিয়া,—এসিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল; আজ য়ুরোপ অস্ত্রের দ্বারা, বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে—আমরা ইস্কুলে পড়িয়া এই আধুনিক য়ুরোপের প্রণালীকেই যেন একমাত্র গৌরবের কারণ বলিয়া মনে না করি।

কিন্তু ইংরেজের বাহুবল নহে, ইংরেজের ইস্কুল ঘরে-বাহিরে, দেহে-মনে, আচারে-বিচারে সর্ব্বত্র আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমাদিগকে যে সকল বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাতে অন্তত কিছুকালের জন্যও আমাদের আত্মপরিচয়ের পথ লোপ করিতেছে। সে আত্মপরিচয় ব্যতীত আমাদের কখনই আত্মোন্নতি হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির যথার্থ উপযোগিতা কি, তাহা এইবার বলিবার সময় উপস্থিত হইল।

দেশবিদেশের লোক বলিতেছে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িতেছে। জগতের উন্নতির যাত্রাপথে পিছাইয়া পড়া ভাল নহে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু অগ্রসর হইবার সকল উপায়ই সমান মঙ্গলকর নহে। নিজের শক্তির দ্বারাই অগ্রসর হওয়াই যথার্থ অগ্রসর হওয়া—তাহাতে যদি মন্দগতিতে যাওয়া যায়, তবে সেও ভাল। অপর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়িয়া অগ্রসর হওয়ার কোনো মাহাত্ম্য নাই—কারণ, চলিবার শক্তিলাভই যথার্থ লাভ, অগ্রসর হওয়ামাত্রই লাভ নহে। ব্রিটিশরাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের কৃতকার্য্যতা কতটুকু! সেখানকার শাসনরক্ষণ-বিধিব্যবস্থা যত ভালই হউক্ না কেন, তাহা ত বস্তুত আমাদের নহে। মানুষ ভুলত্রুটিক্ষতিক্লেশের মধ্য দিয়াই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদিগকে ভুল করিতে দিবার ধৈর্য্য যে ব্রিটিশরাজের নাই। সুতরাং তাঁহারা আমাদিগকে ভিক্ষা দিতে পারেন, শিক্ষা দিতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের যাহা আছে, তাহার সুবিধা আমাদিগকে দিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্বত্ব দিতে পারেন না। মনে করা যাক্, কলিকাতা-ম্যুনিসিপালিটির পূর্ব্ববর্ত্তী কমিশনারগণ পৌর-কার্য্যে স্বাধীনতা পাইয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, সেই অপরাধে অধীর হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। হইতে পারে, এখন কলিকাতার পৌরকার্য্য পূর্ব্বের চেয়ে ভালই চলিতেছে, কিন্তু এরূপ ভাল চলাই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের নিজের শক্তিতে ইহা অপেক্ষা খারাপ চলাও আমাদের পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল। আমরা গরীব এবং নানা বিষয়েই অক্ষম আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য ধনি-জ্ঞানী বিলাতের বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয় নহে বলিয়া শিক্ষাবিভাগে দেশীয় লোকের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করিয়া রাজা যদি নিজের জোরে কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের নকল প্রতিমা গড়িয়া তোলেন, তবে তাহাতে আমাদের কতটুকুই বা শ্রেয় আছে—আমরা গরীবের যোগ্য বিদ্যালয় যদি নিজে গড়িয়া তুলিতে পারি, তবে সেই আমাদের সম্পদ্। যে ভাল আমার আয়ত্ত ভাল নহে, সে ভালকে আমার মনে করাই মানুষের পক্ষে বিষদ বিপদ্। অল্পদিন হইল, একজন বাঙালি ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ দেশীয় রাজ্যশাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাপ্রকাশ করিতেছিলেন—তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটিশরাজ্যের সুব্যবস্থা সমস্তই যেন তাঁহাদেরই সুব্যবস্থা ;—তিনি যে ভারবাহিমাত্র, তিনি যে যন্ত্রী নহেন; যন্ত্রের একটা সামান্য অঙ্গমাত্র, এ কথা যদি তাঁহার মনে থাকিত, তবে দেশীয় রাজ্য-ব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্দ্ধার সহিত অবজ্ঞাপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটিশরাজ্যে আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা যে আমাদের নহে, এই সত্যটি ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, এই কারণেই আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভুলিয়া যাইতেছি,—অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

দেশীয় রাজ্যের ভুলত্রুটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুর-রাজ্যের প্রতি উৎসুকদৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এখানকার রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে যে সকল অভাব ও বিঘ্ন দেখিতে পাই, তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণে, এখানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা

বা শৃঙ্খলার অভাব দেখি, তবে তাহা লইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না,—আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়। এই কারণে, যদি জানিতে পাই, তুচ্ছ স্বার্থপরতা আপনার সামান্য লাভের জন্য,—উপস্থিত ক্ষুদ্র সুবিধার জন্য, রাজশ্রীর মন্দিরভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তবে সেই অপরাধকে আমি ক্ষুদ্র রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এই দেশীয় রাজ্যের লজ্জাকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের লজ্জা এবং ইহার গৌরবকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের গৌরব বলিয়া না বুঝি, তবে দেশের সম্বন্ধে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্য্যের দ্বারা সবল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা যথার্থ উৎকর্ষলাভের আশা করিতে পারিব। ব্রিটিশরাজ ইচ্ছা করিলেও এ সম্বন্ধে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজের মহিমাকেই একমাত্র মহিমা বলিয়া জানেন—এই কারণে ভালমনেও তাঁহারা আমাদিগকে যে শিক্ষা দিতে-ছেন, তাহাতে আমরা স্বদেশকে অবজ্ঞা করিতে শিখিতেছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্যাট্রিয়ট্ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের অনেকেই এই অবজ্ঞাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এইরূপে যাঁহারা ভারতকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করেন, তাঁহারাই ভারতকে বিলাত করিবার জন্য উৎসুক —সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এই অসম্ভব আশা কখনই সফল হইতে পারিবে না।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া-পড়িয়া থাকুন, আর যাহাই হোক্, এইখানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই। বিকৃতি-অনুকৃতির মহামারী এখানে প্রবেশলাভ করিতে না পারুক্, এই আমাদের একান্ত আশা। ব্রিটিশরাজ আমাদের উন্নতি চান, কিন্তু সে উন্নতি ব্রিটিশমতে হওয়া চাই। সে অবস্থায় জলপদ্মের উন্নতি প্রণালী

স্থলপদ্মে আরোপ করা হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্য স্বভাবের অব্যাহত নিয়মে দেশ উন্নতিলাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিবে, ইহাই আমাদের কামনা।

ইহার কারণ এ নয় যে, ভারতের সভ্যতাই সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপের সভ্যতা মানবজাতিকে যে সম্পত্তি দিতেছে, তাহা যে মহামূল্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করা ধৃষ্টতা।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে, এ কথা আমার বক্তব্য নহে—তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই, অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে —উভয় আদর্শের তুলনা করিয়া বিবাদ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, উভয় আদর্শই মানবের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

সেদিন এখানকার কোনো ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, গবর্মেণ্ট-আর্টস্কুলের গ্যালারি হইতে বিলাতি ছবি বিক্রয় করিয়া ফেলা কি ভাল হইয়াছে?

আমি তাহাতে উত্তর করিয়াছিলাম যে, ভালই হইয়াছে। তাহার কারণ এ নয় যে, বিলাতী চিত্রকলা উৎকৃষ্ট সামগ্রী নহে। কিন্তু সেই চিত্রকলাকে এত সস্তায় আয়ত্ত করা চলে না। আমাদের দেশে সেই চিত্রকলার যথার্থ আদর্শ পাইব কোথায়? দুটো লক্ষ্ণৌঠুংরি ও "হিলিমিলি পনিয়া" শুনিয়া যদি কোনো বিলাতবাসী ইংরেজ ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তবে বন্ধুর কর্ত্তব্য তাহাকে নিরস্ত করা। বিলাতী বাজারের কতকগুলি সুলভ আবর্জ্জনা এবং সেই সঙ্গে দুটিএকটী ভাল ছবি চোখের সাম্নে রাখিয়া আমরা চিত্রবিদ্যার যথার্থ আদর্শ কেমন করিয়া পাইব? এই উপায়ে আমরা যেটুকু শিখি, তাহা যে কত নিকৃষ্ট, তাহাও ঠিকমত বুঝিবার উপায় আমাদের দেশে নাই।

যেখানে একটা জিনিষের আগাগোড়া নাই,—কেবল কতকগুলা খাপ্‌-ছাড়া দৃষ্টান্ত আছে মাত্র, সেখানে সে জিনিষের পরিচয়লাভের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়—পরের দেশের ভালটা ত শিখিতেই পারি না, নিজের দেশের ভালটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।

আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কি, তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম, তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার সুবিধা হইত। কারণ, এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে—একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপ্‌ড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহ-ভিত্তিতে নানা-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ একটি সমগ্রমূর্ত্তিরূপে দেখিতে পাই-তাম, ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম—পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিতাম।

এই কারণে, আমাদের শিক্ষার অবস্থায় বিলাতী চিত্রের মোহ জোর করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া ভাল। নহিলে নিজের দেশে কি আছে, তাহা দেখিতে মন যায় না—কেবলি অবজ্ঞায় অন্ধ হইয়া যে ধন ঘরের সিন্ধুকে আছে, তাহাকে হারাইতে হয়।

আমরা দেখিয়াছি, জাপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত এদেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া-ছেন—তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, সেখানি কিনি-বার জন্য জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়া-ছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকানবাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্নকাগজের ছিত্রপট বহুমূল্য

সম্পদের ন্যায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সে শৌখিন চিত্র দেখিলে আমাদের আর্টস্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, কলাবিদ্যা যথার্থভাবে যিনি শিখিয়াছেন, তিনি বিদেশের অপরিচিতরীতির চিত্রের সৌন্দর্য্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান—তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে, তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

আমরা যদি নিজের দেশের শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখিতে শিখিতাম, তবে আমাদের সেই শিল্পদৃষ্টি, শিল্পজ্ঞান জন্মিত, যাহার সাহায্যে শিল্পসৌন্দর্য্যের দিব্যনিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত। কিন্তু বিদেশী শিল্পের নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষায়, আমরা যাহা পাই নাই, তাহাকে পাইয়াছি বলিয়া মনে করি, যাহা পরের তহবিলেই রহিয়া গেছে, তাহাকে নিজের সম্পদ্ জ্ঞান করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া উঠি।

"পিয়ের্-লোটি" ছদ্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশের রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতী আস্‌বাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতী আস্‌বাবখানার নিতান্ত ইতরশ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড় বড় রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞতাবশতই গৌরব করিয়া থাকেন। বস্তুত বিলাতী সামগ্রীকে যথার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভবে। সেখানে শিল্পকলা সজীব, সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি সৃজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্পপদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকালপাত্রের সঙ্গতি সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন—আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার থলি লইয়া মূর্খ দোকানদারের সাহায্যে অন্ধভাবে কতকগুলা থাপ্‌ছাড়া জিনিষপত্র

লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি—তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই আস্‌বাবের দোকান যদি লর্ড কার্জন্ বলপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন, তবে দায়ে পড়িয়া আমরা স্বদেশী সামগ্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতাম—তাহা হইলে টাকার সাহায্যে জিনিষক্রয়ের চর্চ্চা বন্ধ হইয়া রুচির চর্চ্চা হইত। তাহা হইলে ধনিগৃহে প্রবেশ করিয়া দোকানের পরিচয় পাইতাম না, গৃহস্থের নিজের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতাম। ইহা আমাদের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ লাভের বিষয় হইত। এরূপ হইলে আমাদের অন্তরে-বাহিরে, আমাদের স্থাপত্যে-ভাস্কর্য্যে, আমাদের গৃহভিত্তিতে, আমাদের পণ্যবীথিকায় আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করিতাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে সকল দেশেরই ইতরসম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান নাই—সুতরাং তাহারা স্বদেশী সংস্কারের দ্বারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে তাহাদেরই অনুকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বসিবার ঘরে তাহাদের দোকানের সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে,—তবেই মনে করে, আমরা তাহাদেরই ফরমায়েসে তৈরি সভ্যপদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত রুচি অনুসারে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য্য সুলভ ও ইতর অনুকরণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। এদেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অদ্ভুত নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা খাইতে বসিয়াছে।

যেমন শিল্পে, তেম্‌নি সকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া বুঝিতেছি। কেবল বাহিরের সামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন কি, হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে। দেশের পক্ষে এমন বিপদ্ আর হইতেই পারে না।

এই মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য একমাত্র দেশীয় রাজ্যের প্রতি আমরা তাকাইয়া আছি। এ কথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব। পরের অস্ত্র কিনিতে নিজের হাতখানা কাটিয়া ফেলিব না। একলব্যের মত ধনুর্ব্বিদ্যার গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দান করিব না। এ কথা মনে রাখিতেই হইবে, নিজের প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিতে দুর্ব্বল হইতে হয়। ব্যাঘ্রের আহার্য্য-পদার্থ বলকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু হস্তী তাহার প্রতি লোভ করিলে নিশ্চিত মরিবে। আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ভাবে-ভঙ্গীতে প্রত্যহই তাহা করি-তেছি, এইজন্য আমাদের সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে—আমরা কেবলি অকৃতকার্য্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম্ম নহে। উপকরণের বিরলতা, জীবন-যাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব—এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিলাতী কারখানাঘরের প্রভূত জঞ্জাল যদি ঝাঁট দিয়া না ফেলি, তবে দুই দিক্ হইতেই মরিব—অর্থাৎ বিলাতী কারখানাও এখানে চলিবে না, চণ্ডীমণ্ডপও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই কারখানাঘরের ধূমধূলিপূর্ণ বায়ু দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—সহজকে অকারণে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, বাসস্থানকে নির্ব্বাসন করিয়া দাঁড় করাইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজের হাতে মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে, ইংরেজের সামগ্রীকে যদি লইতেই হয়, তবে তাহাকে আপন করিতে না পারিলে তাহাতে অনিষ্টই ঘটে—এবং আপন করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে নিজের প্রকৃতির অনুকূলে পরিণত করিয়া তোলা—

তাহাকে যথাযথ না রাখা। খাদ্য যদি খাদ্যরূপেই বরাবর থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে পুষ্টি দূরে থাক্, ব্যাধি ঘটে। খাদ্য যখন খাদ্যরূপ পরিহার করিয়া আমাদের রসরক্তরূপে মিলিয়া যায় এবং যাহা মিলিবার নহে পরিত্যক্ত হয়, তখনই তাহা আমাদের প্রাণবিধান করে। বিলাতী সামগ্রী যখন আমাদের ভারতপ্রকৃতির দ্বারা জীর্ণ হইয়া তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায়, তখনই তাহা আমাদের লাভের বিষয় হইতে পারে—যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব অবিকৃত থাকে, ততক্ষণ তাহা লাভ নহে। বিলাতী সরস্বতীর পোষ্যপুত্রগণ এ কথা কোনোমতেই বুঝিতে পারেন না। পুষ্টিসাধনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, বোঝাই করাকেই তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান করেন। এইজন্যই আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদেশী কার্য্যবিধির অসঙ্গত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে নিজের শক্তিকে অকারণে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। বিদেশী বোঝাকে যদি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতাম, যদি তাহাকে বোঝার মত না দেখিতে হইত, রাজ্য যদি একটা আপিসমাত্র হইয়া উঠিবার চেষ্টায় প্রতিমুহূর্ত্তে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া না উঠিত, যাহা সজীব হৃৎপিণ্ডের নাড়ির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল তাহাকে যদি কলের পাইপের সহিত সংযুক্ত করা না হইত, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। আমাদের দেশের রাজ্য কেরাণীচালিত বিপুল কারখানা নহে—নির্ভুল নির্ব্বিকার এঞ্জিন্ নহে—তাহার বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রগুলি লৌহদণ্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্তু—রাজলক্ষ্মী প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার কর্ম্মের শুষ্কতার মধ্যে রসসঞ্চার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে [illegible]ন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেন, দেনা-পাওনার ব্যাপারকে কল্যাণের [illegible]তে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন এবং ভুলত্রুটিকে ক্ষমার অশ্রুজলে [illegible] করিয়া থাকেন। আমাদের মন্দভাগ্য আমাদের দেশীয় র[illegible]লকে বিদেশী আপিসের ছাঁচের

মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তোলে—এই সকল স্থানেই আমরা স্বদেশলক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষস্থলের সজীবকোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি, এই আমাদের কামনা। মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলা ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন—দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃকক্ষেআশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।